স্বামী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
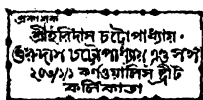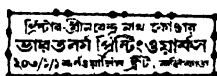
স্বামী

সৌদামিনী নামটা আমার বাবার দেওয়া। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাকে এক বছরের বেশি ত তিনি চোখে দেখে যেতে পান্‌নি, তবে এমন ক'রে আমার ভিতরে বাহিরে মিলিয়ে নাম রেখে গিয়েছিলেন কি কোরে? বীজমন্ত্রের মত এই একটি কথায় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবনের ইতিহাসটাই যেন বাবা ব্যক্ত ক'রে গেছেন!

রূপ? তা আছে মানি; কিন্তু, না গো না, এ আমার দেমাক্ নয়—দেমাক্ নয়। বুক চিরে দেখান যায় না, নইলে এই মুহূর্ত্তেই দেখিয়ে দিতুম, রূপ নিয়ে গৌরব কর্‌বার আমার আর বাকি কিছু নেই—একেবারে—কিছু নেই! আঠারো—উনিশ? হাঁ, তাই বটে। বয়স আমার উনিশই। বাইরের দেহটা আমার তার বেশি প্রাচীন হ'তে পায়নি। কিন্তু, এই বুকের ভিতরটায়? এখানে যে বুড়ী তার উন-আশী বছরের শুক্‌নো হাড়গোড় নিয়ে বাস ক'রে আছে, তাকে দেখ্‌তে পাচ্চো না? পেলে এতক্ষণ ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌তে!

একলা ঘরের মধ্যে মনে হ'লেও ত আজও আমার লজ্জায় মর্‌তে ইচ্ছা করে; তবে এ কলঙ্কের কালী কাগজের উপর ঢেলে দেবার আমার কি আবশ্যক ছিল! সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সেইটাই ত আজ আমাকে বল্‌তে হবে। নইলে আমার মুক্তি হবে কিসে?

সব মেয়ের মত আমিও ত আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের ভিতর

দিয়েই পেয়েছিলুম। তবে কেন তাতে আমার স্বর উঠ্‌ল না। তাই যে দামটা আমাকে দিতে হ'ল, আমার অতি বড় শত্রুর জন্যেও তা এক দিনের জন্যেও কামনা করিনে। কিন্তু দাম আমাকে দিতে হ'ল। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে এক-বিন্দু রেহাই দিলেন না। কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় ক'রে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে যখন আমাকে পথে বার কোরে দিলেন—লজ্জা-সরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না—তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্ব্বনাশী, এ তুই করেছিস্ কি? স্বামী যে তোর আত্মা। তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায়? একদিন না একদিন তোর ঐ শূন্য বুকের মধ্যে তাঁকে যে তোর পেতেই হবে। এ জন্মে হোক্, আগামী জন্মে হোক্, কোটি জন্ম পরে হোক্, তাঁকে যে তোর চাই-ই। তুই যে তাঁরই।

জানি যা হারিয়েছি, তার অনন্ত গুণ আজ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু তবু যে এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে, এটা আমার নারীদেহ। আজ আমার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই, কিন্তু ব্যথা রাখ্‌বারও যে ঠাঁই দেখি না প্রভু! এ দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু যে অহোরাত্র কাঁদ্‌ছে—ওরে অস্পৃশ্যা, ওরে পতিতা, আমাদের আর বেঁধে পোড়াস্‌নে—আমাদের ছুটি দে, আমরা একবার ম'রে বাঁচি!

কিন্তু থাক্ সে কথা।

বাবা মারা গেলেন, এক বছরের মেয়ে নিয়ে মা বাপের বাড়ী চ'লে এলেন। মামার ছেলেপিলে ছিল না, তাই গরীবের ঘর হলেও আমার আদর যত্নের ত্রুটি হ'ল না। বড় বয়স পর্য্যন্ত তাঁর কাছে ব'সে ইংরাজি বাঙলা কত বই না আমি পড়েছিলুম।

কিন্তু মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঠাকুর দেবতা কিছুই মান্‌তেন না। বাড়ীতে একটা পূজা-অর্চ্চনা, কি বার-ব্রতও কোন দিন হ'তে দেখিনি—এ সব, তিনি দু'চক্ষে দেখতে পার্‌তেন না।

নাস্তিক বই কি ?—মামা মুখে বল্‌তেন বটে, তিনি 'Agnostic' কিন্তু সেও ত একটা মস্ত ফাঁকি! কথাটা যিনি প্রথম আবিষ্কার ক'রেছিলেন, তিনি ত শুধু লোকের চোখে ধূলো দিবার জন্যেই নিজেদের আগাগোড়া ফাঁকির পিছনে আর একটা আকাশ-পাতাল-জোড়া ফাঁকি জুড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা ক'রেছিলেন! কিন্তু তখন কি ছাই এ সব বুঝেছিলুম! আসল কথা হ'চ্চে, সূয্যির চেয়ে বালির তাতেই গায়ে বেশি ফোস্কা পড়ে। আমার মামারও হ'য়েছিল ঠিক সেই দশা!

শুধু আমার মা বোধ করি যেন লুকিয়ে ব'সে কি সব ক'র্‌তেন। সে কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ জান্‌তে পেত না। তা' মা যা খুসি করুন, আমি কিন্তু মামার বিদ্যে ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা শিখে নিয়েছিলুম।

আমার বেশ মনে পড়ে, দোরগোড়ায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে দাঁড়ালে সঙ দেখবার জন্যে ছুটে গিয়ে মামাকে ডেকে আন্‌তুম। তিনি তাদের সঙ্গে এম্‌নি ঠাট্টা সুরু ক'রে দিতেন যে, বেচারারা পালাবার পথ পেত না। আমি হেসে হাততালি দিয়ে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়তুম। এমনি করেই আমার দিন কাট্‌ছিল।

শুধু মা এক-একদিন ভারি গোল বাধাতেন। মুখ ভার ক'রে এসে ব'ল্‌তেন, "দাদা, সদুর ত দিন দিন বয়স হ'চ্চে, এখন থেকে একটু খোঁজা-খুঁজি না কর্‌লে, সময়ে বিয়ে দেবে কি ক'রে?"

মামা আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌তেন—"ব'লিস্ কি গিরি, তোর মেয়ে ত এখনো বারো পেরোয়নি—এর মধ্যেই তোর—সাহেবদের মেয়েরা ত এ বয়সে—"

মা কাঁদ-কাঁদ গলায় জবাব দিতেন, "সাহেবদের কথা কেন তুল্‌চ দাদা, আমরা ত সত্যিই আর সাহেব নই! ঠাকুর-দেবতা না মানো, তাঁরা কিছু আর ঝগড়া কর্‌তে আস্‌চেন না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সমাজ ত আছে? তাকে উড়িয়ে দেবে কি ক'রে?"

মামা হেসে বল্‌তেন, "ভাবিস্‌নে বোন্‌ সে সব আমি জানি। এই যেমন তোকে হেসে উড়িয়ে দিচ্চি, ঠিক এমনি করে আমাদের নচ্ছার সমাজটাকেও হেসে উড়িয়ে দেব।"

মা মুখ ভার ক'রে বিড় বিড় ক'রে বকৃতে বকৃতে উঠে যেতেন! মামা গ্রাহ্য কর্‌তেন না বটে, কিন্তু আমার ভারি ভয় হ'ত। কেমন ক'রে যেন বুঝতে পার্‌তুম, মামা যাই বলুন, মার কাছ থেকে আমাকে তিনি রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন না।

কেন যে বিয়ের কথায় ভয় হ'তে সুরু হ'য়েছিল, তা বল্‌চি। আমাদের পশ্চিম-পাড়ার বুক চিরে যে নালাটা গ্রামের সমস্ত বর্ষার জল নদীতে ঢেলে দিত, তার দুই পাড়ে যে দু'ঘরের বাস ছিল, তার এক ঘর আমরা, অন্য ঘর গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদার। এই মজুমদারবংশ যেমন ধনী, তেমনি দুর্দ্দান্ত। গাঁয়ের ভেতরে-বাইরে এদের প্রতাপের সীমা ছিল না। নরেন ছিল এই বংশের একমাত্র বংশধর।

আজ এত বড় মিথ্যেটা মুখে আন্‌তে আমার যে কি হচ্চে, সে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জান্‌বে বল, কিন্তু তখন ভেবেছিলুম, এ বুঝি সত্যি একটা জিনিস,—সত্যই বুঝি নরেনকে ভালবাসি।

কবে যে এই মোহটা প্রথম জন্মেছিল, সে আমি বল্‌তে পারি না। কল্‌কাতায় সে বি-এ পড়্‌ত, কিন্তু ছুটীর সময় বাড়ী এলে মামার সঙ্গে ফিলজফি আলোচনা কর্‌তে প্রায়ই আস্‌ত। তখনকার দিনে Agnoticism'ই ছিল বোধ করি লেখাপড়া-জানাদের ফ্যাসান! এই নিয়েই বেশিভাগ তর্ক হ'ত। কতদিন মামা তার গৌরব দেখাবার জন্য নরেনবাবুর তর্কের জবাব দিতে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কতদিন সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত্রি হয়ে যেত, দু'জনের তর্কের কোন মীমাংসা হ'ত না। কিন্তু, আমিই প্রায় জিত্‌তুম, তার কারণও আর আজ আমার অবিদিত নেই।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়ে মামার মুখপানে চেয়ে গভীর বিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌ত, "আচ্ছা ব্রজবাবু, এই বয়সে এত বড় লজিকের জ্ঞান, তর্ক করবার এমন একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি আপনি একটা ফিনোমিনন ব'লে মনে করেন না ?"

আমি গর্ব্বে, সৌভাগ্যে ঘাড় হেঁট কর্‌তুম। ওরে হতভাগী ! সেদিন ঘাড়টা তোর চিরকালের মত একেবারে ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি কেন ?

মামা উচ্চ-অঙ্গের একটু হাস্য ক'রে বল্‌তেন, "কি জান নরেন, এ শুধু শেখাবার ক্যাপাসিটি।"

কিন্তু তর্কাতর্ক আমার তত ভাল লাগ্‌ত না, যত ভাল লাগ্‌ত তার মুখের মণ্টিক্রিষ্টোর গল্প। কিন্তু গল্পও আর শেষ হ'তে চায় না, আমার অধৈর্য্যেরও আর সীমা পাওয়া যায় না। সকালে ঘুম ভেঙ্গে পর্য্যন্ত সারাদিন একশবার মনে কর্‌তুম, কখন বেলা পড়বে, কখন নরেনবাবু আস্‌বে।

এম্‌নি তর্ক ক'রে আর গল্প শুনে আমার বিয়ের বয়স বারো ছাড়িয়ে তেরোর শেষে গড়িয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে আমার হ'ল না।

তখন বর্ষার নবযৌবনের দিনে মজুমদারদের বাগানের একটা মস্ত বকুলগাছের তলা ঝরা ফুলে-ফুলে একেবারে বোঝাই হ'য়ে যেত। আমাদের বাগানের ধারের সেই নালাটা পার হ'য়ে আমি রোজ গিয়ে কুড়িয়ে আন্‌তুম। সে দিন বিকালেও, মাথার উপর গাঢ় মেঘ উপেক্ষা ক'রেই দ্রুতপদে যাচ্ছি, মা দেখ্‌তে পেয়ে ব'ল্‌লেন, "ওলো, ছুটে ত যাচ্ছিস্, জল যে এল ব'লে।"

আমি বল্‌লুম, "জল এখন আস্‌বে না মা, ছুটে গিয়ে দু'টো কুড়িয়ে আনি।"

মা ব'ল্‌লেন, "পোনর মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নাম্‌বে, সদু, কথা শোন—

যাস্‌নে। এই অবেলায় ভিজে গেলে ঐ চুলের বোঝা আর শুকোবে না তা ব'লে দিচ্চি।"

আমি বল্‌লুম, "তোমার দু'টি পায়ে পড়ি মা, যাই। বৃষ্টি এসে পড়্‌লে মালীদের ওই চালাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব।"—বল্‌তে বল্‌তে ছুটে পালিয়ে গেলুম। মায়ের আমি একটি মেয়ে—দুঃখ দিতে আমাকে কিছুতেই পার্‌তেন না। ছেলে-বেলা থেকেই ফুল যে কত ভালবাসি, সে ত তিনি নিজেও জান্‌তেন, তাই চুপ ক'রে রইলেন। কতদিন ভাবি, সে দিন যদি হতভাগীর চুলের মুঠি ধ'রে টেনে আন্‌তে মা, এমন ক'রে হয় ত তোমার মুখ পোড়াতুম না।

বকুল-ফুলে কোঁচড় প্রায় ভর্ত্তি হ'য়ে এসেছে, এমন সময় মা যা বল্‌লেন তাই হ'ল। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি এল। ছুটে গিয়ে মালীদের চালার মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম। কেউ নেই, খুঁটি ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের পানে চেয়ে ভাবচি, ঝম্ ঝম্ ক'রে ছুটে এসে কে ঢুকে পড়্‌ল। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি—ওমা! এ যে নরেনবাবু! কল্‌কাতা থেকে তিনি যে বাড়ী এসেছেন, কৈ, সে তো আমি শুনিনি!

আমাকে দেখে চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, "অ্যাঁ, সদু যে! এখানে?"

অনেক দিন তাঁকে দেখিনি, অনেক দিন তাঁর গলা শুনিনি, আমার বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ ব'য়ে গেল। কাণ পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল;—মুখের পানে চেয়ে ত জবাব দিতে পারলুম না, মাটীর দিকে চেয়ে বল্‌লুম, "আমি ত রোজই ফুল কুড়ুতে আসি। কবে এলেন?"

নরেন মালীদের একটা ভাঙ্গা খাটিয়া টেনে নিয়ে ব'সে বল্‌লে, "আজ সকালে। কিন্তু তুমি কার হুকুমে ফুল চুরি কর শুনি?"

গম্ভীর গলায় আশ্চর্য্য হয়ে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, চোখ দু'টো তার চাপা হাসিতে নাচ্‌চে।

লজ্জা ! লজ্জা ! এই পোড়ার মুখেও কোথা থেকে হাসি এসে পড়্‌ল, বল্‌লুম, "তাই বই কি ! কষ্ট ক'রে কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয় ?"

নরেন ফস্‌ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "আর আমি যদি ঐ কুড়োনা ফুলগুলো তোমার কোঁচড়ের ভেতর থেকে আর একবার কুড়িয়ে নিই, তাকে কি বলে ?"

জানিনে, কেন আমার ভয় হ'ল, সত্যিই যেন এইবার সে এসে আমার আঁচল চেপে ধর্‌বে। হাতের মুঠো আমার আঁলগা হ'য়ে গিয়ে চোখের পলকে সমস্ত ফুল ঝপ ক'রে মাটীতে পড়ে গেল।

"ও কি ক'র্‌লে ?"

আমি কোনমতে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লুম "আপনাদেরই ত ফুল, বেশ ত, নিন্‌ না কুড়িয়ে।"

"এঁ্যা ! এত অভিমান !" ব'লে সে উঠে আমার আঁচলটা টেনে নিয়ে ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখ্‌তে লাগল। কেন জানিনে, হঠাৎ আমার দু'চোখ জলে ভ'রে গেল, আমি জোর ক'রে মুখ ফিরিয়ে আর একদিকে চেয়ে রইলুম।

সমস্ত ফুলগুলি কুড়িয়ে আমার আঁচলে একটা গেরো দিয়ে, নরেন তার জায়গায় ফিরে গেল। খানিকক্ষণ আমার পানে চুপ ক'রে চেয়ে থেকে বল্‌লেন, "যে ঠাট্টা বুঝতে পারে না, এত অল্পে রাগ করে, তার ফিলজফি পড়া কেন ? আমি কালই গিয়ে ব্রজবাবুকে ব'লে দেব, তিনি আর যেন পণ্ডশ্রম না করেন।"

আমি আগেই চোখ মুছে ফেলেছিলুম, বল্‌লুম, "কে রাগ করেছে ?"

"যে ফুল ফেলে দিলে।"

"ফুল ত আপনি প'ড়ে গেল।"

"মুখখানাও বুঝি আপনি ফিরে আছে ?"

"আমি ত মেঘ দেখ্‌চি।"

"মেঘ বুঝি এ দিকে ফিরে দেখা যায় না ?"

"কৈ যায় ?" ব'লে আমি ভুলে হঠাৎ মুখ ফেরাতেই দু'জনের চোখোচোখি হ'য়ে গেল। নরেন ফিক্ ক'রে হেসে বল্‌লে, "একখানা আরসি থাক্‌লে যায় কি না, দেখিয়ে দিতুম। নিজের মুখে চোখেই একসঙ্গে মেঘ-বিদ্যুৎ দেখতে পেতে; কষ্ট ক'রে আকাশে খুঁজতে হ'ত না।"

আমি তখন চোখ ফিরিয়ে নিলুম। রূপের প্রশংসা আমি ঢের শুনেছি, কিন্তু নরেনের চাপা হাসি, চাপা ইঙ্গিত, সেদিন আমার বুকের মধ্যে ঢুকে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন সজোরে দুলিয়ে দিলে। এই ত সে পাঁচ বছর আগের কথা, কিন্তু আজ মনে হয়, সে সৌদামিনী বুঝি বা আর কেউ ছিল!

নরেন বললে, "মেঘ না কাটলে ব্রজবাবুকে ব'লে দেব, লেখা-পড়া শেখানো মিছে। তিনি আর যেন কষ্ট না করেন।"

আমি বল্‌লুম, "বেশ ত, ভালই ত। আমি ওসব পড়তেও চাইনে, বরং গল্পের বই পড়তেই আমার ঢের ভাল লাগে।"

নরেন হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল, "দাঁড়াও ব'লে দিচ্ছি—আজ কাল নভেল পড়া হচ্চে বুঝি ?"

আমি বল্‌লুম, "গল্পের বই তবে আপনি নিজে পড়েন কেন ?"

নরেন বল্‌লে, "সে শুধু তোমাকে গল্প বল্‌বার জন্যে। নইলে পড়তুম না।" বৃষ্টির দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, এ জল যদি আজ না থামে ? কি কর্‌বে ?"

বল্‌লুম, "ভিজে-ভিজে চ'লে যাব।"

"আচ্ছা, এ যদি আসামের পাহাড়ী বৃষ্টি হ'ত, তা হ'লে ?"

গল্প জিনিসটা চিরদিন কি ভালই বাসি! একটুখানি গন্ধ পাবামাত্র আমার চোখের দৃষ্টি একমুহূর্ত্তে আকাশ থেকে নরেনের মুখের উপর

নেমে এল। জিজ্ঞাসা ক'রে ফেল্‌লুম, "সে দেশে বৃষ্টির মধ্যে বুঝি বেরোনো যায় না?"

নরেন বল্‌লে, "একেবারে না। গায়ে তীরের মত বেঁধে।"

"আচ্ছা, তুমি সে বৃষ্টি দেখেছ?" পোড়া মুখ দিয়ে 'তুমি' বার হ'য়ে গেল। ভাবি, জিভটা সঙ্গে সঙ্গে যদি মুখ থেকে খ'সে প'ড়ে যেত!

সে বল্‌লে, "এর পর যদি একজন 'আপনি' ব'লে ডাকে, সে আর একজনের মরা-মুখ দেখ্‌বে।"

"কেন দিব্যি দিলেন? আমি ত কিছুতেই 'তুমি' ব'ল্‌ব না।"

"বেশ, তা হলে মরা-মুখ দেখো।"

"দিব্যি কিছুই না। ও আমি মানিনে।"

"কেমন মান না, একবার 'আপনি' বলে প্রমাণ ক'রে দাও।"

মনে মনে রাগ ক'রে ব'ল্‌লুম, পোড়ারমুখী! মিছে তেজ তোর রইল কোথায়? মুখ দিয়ে ত কিছুতে বার করতে পার্‌লিনে! কিন্তু দুর্গতির যদি ঐখানেই সেদিন শেষ হয়ে যেত!

ক্রমে আকাশের জল থাম্‌ল বটে, কিন্তু পৃথিবীর জলে সমস্ত দুনিয়াটা যেন ঘুলিয়ে একাকার ক'রে দিলে। সন্ধ্যা হয়-হয়। ফুল ক'টি আঁচলে বাঁধা, কাদা-ভরা বাগানের পথে বেরিয়ে পড়্‌লুম।

নরেন বল্‌লে, "চল, তোমাকে পৌঁছে দি।"

আমি বল্‌লুম, "না।"

মন যেন ব'লে দিলে, সেটা ভাল না। কিন্তু অদৃষ্টকে ডিঙিয়ে যাবো কি ক'রে? বাগানের ধারে এসে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। সমস্ত নালাটা জলে পরিপূর্ণ। পার হই কি করে?

নরেন সঙ্গে আসেনি, কিন্তু সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল। আমাকে চুপ ক'রে দাঁড়াতে দেখে, অবস্থাটা বুঝে নিতে তার দেরী হ'ল না। কাছে এসে বল্‌লে, "এখন উপায়?"

আমি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্‌লুম, "নালায় ডুবে মরি, সেও আমার ভালো, কিন্তু একলা অত দূর সদর রাস্তা ঘুরে আমি কিছুতে যাব না। মা দেখলে—"

কথাটা আমি শেষ কর্‌তেই পার্‌লুম না।

নরেন হেসে বল্‌লে, "তার আর কি, চল, তোমাকে সেই পিটুলি গাছটার উপর দিয়ে পার ক'রে দিই।"

তাই ত বটে! আহ্লাদে মনে মনে নেচে উঠ্‌লুম। এতক্ষণ আমার মনে পড়েনি যে খানিকটা দূরে একটা পিটুলি গাছ বহুকাল থেকে ঝড়ে উপড়ে নালার ওপর ব্রিজের মত প'ড়ে আছে। ছেলেবেলায় আমি নিজেই তার উপর দিয়ে এপার-ওপার হয়েচি।

খুসী হয়ে বল্‌লুম, "তাই চল—"

নরেন তার চেয়েও খুসী হয়ে বল্‌লে, "কেমন মিষ্টি শোনালে বলত!"

বল্‌লুম, "যাও—"

সে বললে, "নির্ব্বিঘ্নে পার না ক'রে দিয়ে কি আর যেতে পারি!"

বল্‌লুম, "তুমি কি আমার পারের কাণ্ডারী না কি?"

আমি আজও ভেবে পাইনি, এ কথা কি ক'রেই বা মনে এল এবং কেমন ক'রেই বা মুখ দিয়ে বা'র কর্‌লুম। কিন্তু সে যখন আমার মুখপানে চেয়ে একটু হেসে বল্‌লে, "দেখি, তাই যদি হ'তে পারি"—আমি ঘেন্নায় যেন ম'রে গেলুম!

সেখানে এসে দেখি, পার হওয়া সোজা নয়। একে ত স্থানটা গাছের ছায়ায় অন্ধকার, তাতে, সেই পিটুলি গাছটাই জলে ভিজে ভিজে যেমন পিছল, তেমনি উঁচু নীচু হয়ে আছে। তলা দিয়ে সমস্ত বৃষ্টির জল হুহু শব্দে বয়ে যাচ্চে—আমি একবার পা বাড়াই, একবার টেনে নিই! নরেন খানিকক্ষণ দেখে বল্‌লে, "আমার হাত ধ'রে যেতে পার্‌বে?"

বল্‌লুম, "পার্‌ব।" কিন্তু তার হাত ধ'রে এমনি কাণ্ড করলুম যে,

সে কোন মতে টাল্ সাম্‌লে এ দিকে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মরক্ষা কর্‌লে। কয়েক মুহূর্ত্ত সে চুপ ক'রে আমার মুখপানে চেয়ে রইল, তার পরেই তার চোখ দু'টো যেন ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠল। বল্‌লে, "দেখবে, একবার সত্যিকারের কাণ্ডারী হ'তে পারি কি না?"

আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, "কি ক'রে?"

"এম্‌নি ক'রে" বলেই সে নত হ'য় আমার দুই হাঁটুর নীচে এক হাত, ঘাড়ের নীচে অন্য হাত দিয়ে চোখের নিমিষে তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে সেই গাছটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে আমি চোখ বুজে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধর্‌লুম। নরেন দ্রুতপদে পার হ'য়ে এপারে চ'লে এল। কিন্তু নামাবার আগে—আমার ঠোঁট দু'টোকে একেবারে যেন পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু থাক্ গে! কম ঘেন্নায় কি আর এ দেহের প্রতি-অঙ্গ অহর্নিশি গলায় দড়ি দিতে চায়!

শিউরুতে শিউরুতে বাড়ী চ'লে এলুম, ঠোঁট দু'টো তেমনি জ্বল্‌তেই লাগল বটে, কিন্তু সে জ্বালা লঙ্কামরিচখোরের জ্বলুনির মত যত জ্বল্‌তে লাগল জ্বালার তৃষ্ণা তত বেড়ে যেতেই লাগল।

মা বল্‌লেন, "ভ্যালা মেয়ে তুই সদু,—এলি কি কোরে? নালাটা ত জলে জলমগ্ন হয়েছে দেখে এলুম। সেই গাছটার ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে এলি? প'ড়ে মর্‌তে পার্‌লিনে!"

"না মা, সে পুণ্য থাক্‌লে আর এ গল্প লেখবার দরকার হবে কেন?"

তার পরদিন নরেন, মামার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এল। আমি সেই-খানেই বসেছিলুম,—তার পানে চাইতে পারলুম না, কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালাই, কিন্তু ঘরের পাকা মেঝে যেন চোরা বালির মত আমার পা দু'টোকে একটু একটু ক'রে গিলতে লাগল—আমি নড়তেও পারলুম না, মুখ তুলে দেখতেও পার্‌লুম না।

নরেনের যে কি অসুখ হ'ল, তা শয়তানই জানে, অনেক দিন পর্য্যন্ত

আর সে কল্‌কাতায় গেল না। রোজই দেখা হতে লাগল! মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে বলতে লাগ্‌লেন, "ওদের পুরুষ মানুষদের লেখাপড়ার কথাবার্ত্তা হয়, তুই তাব মধ্যে হাঁ ক'রে ব'সে কি শুনিস্ বল্ ত? যা বাড়ীর ভেতরে যা। এত বড় মেয়ের যদি লজ্জা-সরম একটুকু আছে।"

এক-পা এক-পা ক'রে আমার ঘরে চ'লে যেতুম, কিন্তু কোন কাজে মন দিতে পারতুম না। যতক্ষণ সে থাকৃত তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অবিশ্রাম বাইরের পানেই আমাকে টান্‌তে থাকৃত।

আমার মামা আর যাই হোন্, তাঁর মনটা প্যাঁচালো ছিল না। তা'ছাড়া, লিখে প'ড়ে তর্ক ক'রে ভগবান্‌কে উড়িয়ে দেবার ফন্দিতেই সমস্ত অন্তঃকরণটা তাঁর এমনি অনুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকৃত যে, তাঁর নাকের ডগায় কি যে ঘট্‌চে তা দেখতে পেতেন না। আমি এই বড় একটা মজা দেখেছি, জগতের সব চেয়ে নামজাদা নাস্তিকগুলাই হচ্চে সব চেয়ে নিরেট বোকা। ভগবানের যে লীলার অন্ত নেই। তিনি যে এই 'না' রূপেই তাদের পোনর-আনা মন ভরে থাকেন, এ তারা টেরই পায় না। সপ্রমাণ হোক্, অপ্রমাণ হোক্, তাঁর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে বলে, "সংসারে মানুষগুলো কি বোকা! তারা সকাল-সন্ধ্যায় ব'সে মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করে!" আমার মামারও ছিল সেই দশা! তিনি কিছুই দেখ্‌তে পেতেন না। কিন্তু মা ত তা' নয়। তিনি যে আমারই মত মেয়েমানুষ। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ ছিল না! আমি নিশ্চয় জানি, মা আমাদের সন্দেহ ক'রেছিলেন।

আর সামাজিক বাধা আমাদের দু'জনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনি জান্‌তেন, আমি জান্‌তুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠ্‌ত, তাই ভাবনার এই

বিশ্রী দিক্‌টাকে আমি দু'হাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেলচি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হ'লে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেচে, জল দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না! নির্জ্জলা বিষের আগুনে কলজে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ।

আর একটা জিনিস আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পারতুম না। সেটা মজুমদারদের ঐশ্বর্য্যের চেহারা! ছেলে বেলা মায়ের সঙ্গে কতদিনই ত তাদের বাড়ীতে বেড়াতে গেছি। সেই সব ঘোর দোর ছবি দেওয়াল-গিরি, আলমারি, সিন্দুক, আস্‌বাব-পত্রের সঙ্গে কোন্ একটা ভাবী ছোট্ট একতালা শ্বশুরবাড়ীর কদাকার মূর্ত্তি কল্পনা ক'রে মনে মনে আমি যেন শিউরে উঠতুম!

মাসখানেক পরে একদিন সকালবেলা নদী থেকে স্নান ক'রে বাড়ীতে পা দিয়েই দেখি, বারান্দার ওপর একজন প্রৌঢ়া-গোছের বিধবা স্ত্রীলোক মায়ের কাছে ব'সে গল্প কর্‌চে। আমাকে দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, "এইটি বুঝি মেয়ে?"

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, "হাঁ মাঁ, এই আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন, ন'ইলে—"

স্ত্রীলোকটী হেসে বল্‌লে, "তা হোক্। ছেলেটির বয়সও প্রায় ত্রিশ, দু'জনের মানাবে ভাল। আর ঐ শুন্‌তেই দোজবরে, নইলে যেন কার্ত্তিক।"

আমি দ্রুতপদে ঘরে চ'লে গেলুম। বুঝলুম, ইনি ঘটক্ ঠাকুরুণ, আমার সম্বন্ধ এনেছেন।

মা চেঁচিয়ে বললেন, "কাপড় ছেড়ে একবার এসে বোস্ মা!"

কাপড় ছাড়া চুলোয় গেল, ভিজে কাপড়েই দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাণ পেতে শুন্‌তে লাগ্‌লুম। বুকের কাঁপুনি যেন আর থাম্‌তে

চায় না। শুনতে পেলুম, চিতোর গ্রামের কে একজন রাধাবিনোদ মুখুয্যের ছেলে ঘনশ্যাম। পোড়াকপালে না কি অনেক দুঃখ ছিল, তাই আজ যে নাম জপের মন্ত্র, সে নাম শুনে সেদিন গা জ্বলে যাবে কেন!

শুনলুম, বাপ্ নেই, কিন্তু মা আছেন। ছোট দু'টি ভাই এক ভায়ের বিয়ে হ'য়েচে, একটি এখনও পড়ে। সংসার বড়রই ঘাড়ে, তাই, এনট্রান্স পাশ করেই রোজগারের ধান্দায় পড়া ছাড়তে হ'য়েছে। ধান, চাল, তিসি, পাট প্রভৃতির দালালি ক'রে, উপায় মন্দ করেন না। তাঁরই উপর সমস্ত নির্ভর। তা'ছাড়া ঘরে নারায়ণ শিলা আছেন, দু'টো গরু আছে, বিধবা বোন্ আছে—নেই কি?

—নেই শুধু সংসারের বড়-বৌ। সাত বছর আগে বিয়ের এক মাসের মধ্যেই তিনি মারা যান, তারপর এতদিন বাদে এই চেষ্টা। সাতবচ্ছর! ঘটকীকে উদ্দেশ ক'রে মনে মনে বললুম, "পোড়ারমুখী এতদিন কি তুই শুধু আমার মাথা খেতেই চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিলি?"

মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় ছেড়ে কাছে এসে বসলুম। সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বললে, "মেয়ে পছন্দ হয়েচে, এখন দিন স্থির করলেই হ'ল।" মায়ের চোখ দু'টিতে জল টলটল করতে লাগল, বললেন, "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা, আর কি বলব!"

মামা শুনে বললেন, "এনট্রান্স? তবে ব'লে পাঠা, এখন বছর দুই সদুর কাছে ইংরিজি প'ড়ে যাক্, তবে বিয়ের কথা কওয়া যাবে।"

মা বললেন, "তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অমত কোরো না, এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না। দিতে থুতে কিছু হবে না—"

মামা বললেন "তাহলে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় দিগে যা, সেও এক পয়সা চাইবে না।"

মা বললেন, "পনেরয় পা দিলে যে—"

মামা বল্‌লেন, "তা ত'দেখেই ; পনর বছর বেঁচে রয়েছে যে !"

মা রাগে দুঃখে কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে বল্‌লেন, "তুমি কি ওর তবে বিয়ে দেবে না দাদা ? এর পরে একেবারেই পাত্র জুট্‌বে না।"

মামা বল্‌লেন, "সেই ভয়ে ত আগে থেকে ওকে জলে ফেলে দিতে পারা যায় না।"

মা বল্‌লেন, "ছেলেটীকে একবার নিজের চোখে দেখে এসো না দাদা, পছন্দ না হয়, না দেবে।"

মামা বল্‌লেন, "সে ভাল কথা। রবিবার যাব ব'লে চিঠি লিখে দিচ্চি।"

ভাঙ্‌চির ভয়ে কথাটা মা গোপনে রেখেছিলেন এবং মামাকেও সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি জান্‌তেন না, এমন চোখ-কাণও ছিল —যাকে কোন সতর্কতা ফাঁকি দিতে পারে না।

বাগানে এক টুক্‌রো শাকের ক্ষেত করেছিলুম। দিন দুই পরে দুপুরবেলা একটা ভাঙা খুন্‌তি নিয়ে তার ঘাস তুল্‌চি, পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি, নরেন। তার সে রকম মুখের চেহারা অনেক দিন পরে আর একবার দেখেছিলুম, সত্যি, কিন্তু আগে কখনো দেখিনি। বুকে এমন একটা ব্যথা বাজ্‌ল, যা কখনো কোন দিন পাই নি। সে বল্‌লে, "আমাকে ছেড়ে কি সত্যিই চল্‌লে ?"

কথাটা বুঝেও যেন বুঝতে পারলুম না। ব'লে ফেল্‌লুম, "কোথায় ?"

সে বল্‌লে, "চিতোর।"

স্পষ্ট হ'বামাত্রই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল—কোন উত্তর মুখে এলো না।

সে পুনরায় বল্‌লে, "তাই আমিও বিদায় নিতে এসেছি ; বোধ হয় জন্মের মতই। কিন্তু তার আগে দু'টো কথা বল্‌তে চাই—শুন্‌বে ?"

বল্‌তে বল্‌তেই তার গলাটা যেন ধ'রে গেল। তবুও আমার মুখে কথা

যোগাল না—কিন্তু মুখ তুলে চাইলুম। এ কি? দেখি, তার দু'চোখ ব'য়ে ঝর্-ঝর্ ক'রে জল প'ড়্ছে।

ওরে পতিতা! ওরে দুর্ব্বল নারী! মানুষের চোখের জল সহ্য করবার ক্ষমতা ভগবান্ তোরে যখন একেবারে দেন নি, তখন তোর আর সাধ্য ছিল কি! দেখ্তে দেখ্তে আমারও চোখের জলে বুক ভেসে গেল। নরেন কাছে এসে কোঁচার খুঁট দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হাত ধ'রে বল্লে, "চল, ওই গাছটার তলায় গিয়ে বসি গে—এখানে কেউ দেখ্তে পাবে।"

মনে বুঝ্লুম, এ অন্যায়—একান্ত অন্যায়! কিন্তু তখনও যে তার চোখের পাতা ভিজে, তখনও যে তার কণ্ঠস্বর কান্নায় ভরা।

বাগানের একপ্রান্তে একটা কাঁটালি-চাঁপার কুঞ্জ ছিল, তার মধ্যে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালে।

একটা ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুর্ দুর্ কর্ছিল, কিন্তু সে নিজেই দূরে গিয়ে ব'সে বল্লে, "এই একান্ত নির্জ্জন স্থানে তোমাকে ডেকে এনেছি বটে, কিন্তু তোমাকে ছোঁব না। এখনও তুমি আমার হও নি।"

তার শেষ-কথায় আবার পোড়া চোখে জল এসে পড়্ল। আঁচলে চোখ মুছে মাটীর দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম।

তার পরে অনেক কথাই হ'ল, কিন্তু থাক্ গে সে সব। আজও ত প্রতিদিনকার অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্য্যন্ত মনে করতে পারি,—মরণেও যে বিস্মৃতি আসবে, সে আশা কর্তেও যেন ভরসা হয় না; একটা কারণে আমি আমার এত বড় দুর্গতিতেও কোন দিন বিধাতাকে দোষ দিতে পারিনি। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার চিত্তের মাঝে থেকে নরেনের সংস্রব তিনি কোন দিন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন নি। সে যে আমার জীবনে কত বড় মিথ্যে, এ তো তাঁর অগোচর ছিল না। তাই তার প্রণয়-নিবেদনের মুহূর্ত্তের উত্তেজনা পরক্ষণের কত বড় অবসাদে যে ডুবে

যেত, সে আমি ভুলিনি। যেন কার কত চুরি-ডাকাতি, সর্ব্বনাশ ক'রে ঘরে ফিরে এলুম, এম্‌নি মনে হ'ত। কিন্তু এমনি পোড়া কপাল যে, অন্তর্যামীর এত বড় ইঙ্গিতেও আমার হুঁস হয় নি। হবেই বা কি ক'রে? কোন দিন ত শিখিনি যে, ভগবান্ মানুষের বুকের মধ্যেও বাস করেন। এ সব তাঁরই নিষেধ।

মামা পাত্র দেখ্‌তে যাত্রা কর্‌লেন। যাবার সময় কতই না ঠাট্টা-তামাসা ক'রে গেলেন। মা মুখ চুণ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে বেশ বুঝলেন, এ যাওয়া পণ্ডশ্রম। পাত্র তাঁর কিছুতে পছন্দ হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ফিরে এসে আর বড় ঠাট্টা বিদ্রূপ কর্‌লেন না। বল্‌লেন, "হাঁ, ছেলেটি পাশ-টাস তেমন কিছু কর্‌তে পারেনি বটে, কিন্তু মুখ্যু ব'লেও মনে হ'ল না! তা ছাড়া বড় নম্র, বড় বিনয়ী। আর একটা কি জানিস্ গিরি, ছেলেটির মুখের ভাবে কি একটু আছে, ইচ্ছে হয়, ব'সে ব'সে আরও দু'দণ্ড আলাপ করি।"

মা আহ্লাদে মুখখানি উজ্জ্বল ক'রে বল্‌লেন, "তবে আর আপত্তি ক'রো না দাদা, মত দাও—সত্বর একটা কিনারা হ'য়ে যাক্।"

মামা বল্‌লেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে নিরাশার আশাটুকু বুকে চেপে ধ'রে মনে মনে বল্‌লুম, "যাক্, মামা এখনো মনস্থির কর্‌তে পারেন নি। এখনও বলা যায় না। কিন্তু কে জান্‌ত, তাঁর ভাগ্নীর বিয়ের সম্বন্ধে মতিস্থির কর্‌বার পূর্ব্বেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে মতিস্থির কর্‌বার ডাক এসে পড়্‌বে। যাঁকে সারাজীবন সন্দেহ ক'রে এসেছেন, সে দিন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর দূত এসে যখন একেবারে মামার শিয়রে দাঁড়াল, তখন তিনি চম্‌কে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদেরও বড় কম চমক লাগ্‌ল না। মাকে কাছে ডেকে বল্‌লেন, "আমি মত দিয়ে যাচ্ছি বোন, সত্বর সেইখানেই

বিয়ে দিস্। ছেলেটির যথার্থ ভগবানে বিশ্বাস আছে। মেয়েটা সুখে থাক্‌বে।"—অবাক্ কাণ্ড! কিন্তু অবাক্ হলেন না শুধু মা। নাস্তিকতা তিনি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তেন না। তাঁর ধারণা ছিল, মরণকালে সবাই ঘুরে ফিরে হরি বলে। তাই তিনি বল্‌তেন, 'মাতাল তার মাতাল বন্ধুকে যত ভালই বাসুক না কেন, নির্ভর কর্‌বার বেলায় করে শুধু তাকে—যে মদ খায় না।' জানি না, কথাটা কতখানি সত্যি।

হৃদ্‌রোগে মামা মারা গেলেন, আমরা পড়লুম অকূল-পাথারে। সুখে দুঃখে কিছু দিন কেটে গেল বটে, কিন্তু যে বাড়ীতে অবিবাহিতা মেয়ের বয়স পোনর পার হ'য়ে যায়, সেখানে আলস্যভরে শোক কর্‌বার সুবিধা থাকে না। মা চোখ মুছে উঠে ব'সে আবার কোমর বেঁধে লাগলেন।

অবশেষে অনেক দিন অনেক কথা কাটাকাটির পর, বিবাহের লগ্ন যখন সত্যিই আমার বুকে এসে বিঁধ্‌ল, তখন বয়সও ষোল পার হ'য়ে গেল। তখনও আমি প্রায় এম্‌নিই লম্বা। আমার এই দীর্ঘ দেহটার জন্য জননীর লজ্জা ও কুণ্ঠার অবধি ছিল না। রাগ ক'রে প্রায়ই ভৎর্সনা করতেন, 'হতভাগা মেয়েটার সবই সৃষ্টিছাড়া!' একে ত বিয়ের কনের পক্ষে সতের বছর একটা মারাত্মক অপরাধ, তার উপর এই দীর্ঘ গড়নটা যেন তাকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ সে রাতটার জন্যও যদি আমাকে কোন রকমে মুচ্‌ড়ে মাচ্‌ড়ে একটু খাটো ক'রে তুলতে পার্‌তেন, মা বোধ করি তাতেও পেছুতেন না। কিন্তু সে তো হবার নয়। আমি আমার স্বামীর বুক ছাড়িয়ে একেবারে দাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছুলুম।

কিন্তু শুভদৃষ্টি হ'ল না, আমি ঠিক রাগে নয়, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণায় চোখ বুজে রইলুম। কিন্তু তাও বলি, এমন কোন অসহ্য মর্ম্মান্তিক দুঃখও তখন আমি মনের মধ্যে পাইনি!

ইতিপূর্ব্বে কত দিন সারা রাত্রি জেগে জেগে ভেবেছি, এমন দুর্ঘটনা

যদি সত্যিই কপালে ঘটে,' নরেন এসে আমাকে না নিয়ে যায়, তবু আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে কোন মতেই হ'তে পারবে না। সে রাত্রে নিশ্চয় আমার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে, ধরাধরি ক'রে আমাকে বিবাহ-সভা থেকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হবে, এ বিশ্বাস আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু কৈ কিছুই ত হ'ল না। আরও পাঁচজন বাঙ্গালীর মেয়ের যেমন হয় শুভকর্ম্ম তেমনি ক'রে আমারও সমাধা হয়ে গেল, এবং তেমনি ক'রেই একদিন শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করলুম।

শুধু যাবার সময়টিতে পাল্কীর ফাঁক দিয়ে সেই কাঁটালি-চাঁপার কুঞ্জ-টায় চোখ পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এল। সে যে আমাদের কত দিনের কত চোখের জল, কত দিব্যি-দিলাশার নীরব-সাক্ষী।

আমার চিতোর গ্রামের সম্বন্ধটা যে দিন পাকা হ'য়ে গেল, ওই গাছটার আড়ালে বসেই অনেক অশ্রু-বিনিময়ের পর স্থির হয়েছিল, সে এসে একদিন আমাকে নিয়ে চলে যাবে। কেন, কোথায় প্রভৃতি বাহুল্য প্রশ্নের তখন আবশ্যক হয় নি।

আর কিছু না, শুধু যাবার সময় একবার যদি দেখা হ'ত!—কেন সে আমাকে আর চাইলে না, কেন আর একটা দিনও দেখা দিলে না—শুধু যদি খবরটা পেতুম।

শ্বশুরবাড়ী গেলুম, বিয়ের বাকি অনুষ্ঠানও শেষ হ'য়ে গেল। অর্থাৎ আমি আমার স্বামীর ধর্ম্মপত্নীর পদে এইবার পাকা হয়ে বসলুম।

দেখলুম, স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা শুধু একা আমার নয়। বাড়ীশুদ্ধ আমার দলে। শ্বশুর নেই, সৎ-শাশুড়ী, তার নিজের ছেলে দু'টি, একটি বউ এবং বিধবা মেয়েটি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত! এতদিন নিরাপদে সংসার করছিলেন, হঠাৎ একটা সতেরো আঠারো বছরের মস্ত বৌ দেখে তাঁর সমস্ত মন সশস্ত্র জেগে উঠল। কিন্তু মুখে বললেন, "বাঁচলুম বৌমা, তোমার

হাতে সংসার ফেলে দিয়ে এখন দু'দণ্ড ঠাকুরদের নাম করতে পাবো। ঘনশ্যাম আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশি ; সে বেঁচে থাকলেই তবে সব বজায় থাকবে, এইটি বুঝে শুধু কাজ ক'রো মা, আর কিছু আমি চাইনে।"

তাঁর কাজ তিনি করবেন, আমার কাজ আমি করলুম, বললুম, "আচ্ছা।" কিন্তু সে ওই কুস্তিগীরের তাল ঠোকার মত। প্যাঁচ মারতে যে দু'জনেই জানি, তা ইসারায় জানিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কত শীঘ্র মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষকে চিনতে পারে, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁকে জানতে আমারও যেমন দেরি হোল না, আমাকেও দু'দিনের মধ্যে চিনে নিয়ে তিনিও তেমনি আরামের নিশ্বাস ফেললেন। বেশ বুঝলেন, স্বামীর খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, খরচপত্র নিয়ে দিবারাত্র চক্র ধ'রে ফোঁস্-ফোঁস্ ক'রে বেড়াবার মত আমার উৎসাহও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

মেয়েমানুষের তূণে যত প্রকার দিব্যাস্ত্র আছে, "আড়ি পাতাটা" ব্রহ্মাস্ত্র। সুবিধা পেলে এতে মা-মেয়ে, শাশুড়ী-বৌ, জা-ননদ, কেউ কাকে খাতির করে না। আমি ঠিক জানি, আমি যে পালঙ্কে না শুয়ে ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর টেনে নিয়ে সারারাত্রি প'ড়ে থাকতুম, এ সুসংবাদ তাঁর অগোচর ছিল না। আগে যে ভেবেছিলুম, নরেনের বদলে আর কারো ঘর করতে হ'লে সেই দিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখলুম, সেটা ভুল। ফাটবার চেরবার কোন লক্ষণই টের পেলুম না। কিন্তু তাই ব'লে একশয্যায় শুতেও আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হ'লো না।

দেখলুম, আমার স্বামীটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। আমার আচরণ নিয়ে তিনি কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন কথাই কইলেন না। অথচ মনে মনে রাগ কিংবা অভিমান ক'রে আছেন, তাও না। শুধু একদিন একটু হেসে বললেন, "ঘরে আর একটা খাট এনে বিছানাটা বড় ক'রে নিলে কি শুতে পার না ?"

আমি বল্‌লুম, "দরকার কি, আমার ত কষ্ট হয় না।"

তিনি বল্‌লেন, "না হ'লেও একদিন অসুখ ক'রতে পারে যে।"

আমি বল্‌লুম, "তোমার এতই যদি ভয়, আমার আর কোন ঘরে শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার না?"

তিনি বল্‌লেন, "ছিঃ, তা কি হয়? তাতে কত রকমের অপ্রিয় আলোচনা উঠ্‌বে।"

বল্‌লুম, "ওঠে উঠুক, আমি গ্রাহ্য করি নে।"

তিনি একমুহূর্ত্ত চুপ করে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বল্‌লেন, "এত বড় বুকের পাটা যে তোমার চিরকাল থাক্‌বে, এমন কি কথা আছে?" ব'লে একটুখানি হেসে কাজে চ'লে গেলেন।

আমার মেজ-দেওর টাকা চল্লিশের মত কোথায় চাক্‌রী করতেন; কিন্তু একটা পয়সা কখন সংসারে দিতেন না। অথচ, তাঁর আফিসের সময়ের ভাত, আফিস থেকে এলে পা ধোবার গাড়ু-গামছা, জল-খাবার, পান তামাক ইত্যাদি যোগাবার জন্যে বাড়ী শুদ্ধ সবাই যেন ত্রস্ত হয়ে থাকৃত। দেখ্‌তুম, আমার স্বামী আর আমার মেজ-দেওর হয় ত কোন দিন একসঙ্গেই বিকেলবেলায় বাড়ী ফিরে এলেন, সবাই তাঁর জন্যেই ব্যতিব্যস্ত; এমন কি চাকরটা পর্য্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন কর্‌বার জন্যে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে। তাঁর একতিল দেরী কিংবা অসুবিধা হ'লে যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। অথচ আমার স্বামীর দিকে কেউ চেয়েও দেখ্‌ত না। তিনি আধঘণ্টা ধ'রে হয় ত এক ঘটী জলের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন—কারও সে দিকে গ্রাহ্যই নেই। অথচ এদের খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধের জন্যেই তিনি দিবা-রাত্রি খেটে মর্‌চেন। ছ্যাকৃরা গাড়ীর ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে, কিন্তু, তাঁর যেন কিছুতেই শ্রান্তি নেই, কোন দুঃখই যেন তাঁকে পীড়া দিতে পারে না। এমন শান্ত, এত ধীর,—এত পরিশ্রমী, এর আগে কখনও আমি চোখে দেখিনি। আর চোখে দেখেচি ব'লেই

লিখতে পারৃচি, নইলে শোনা কথা হ'লে বিশ্বাস করৃতেই পারতুম না, সংসারে এমন ভাল মানুষও থাকৃতে পারে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সব তাতেই বলৃতেন, "থাক্ থাক্, আমার এতেই হবে।"

স্বামীর প্রতি আমার মায়াই ত ছিল না, বরঞ্চ বিতৃষ্ণার ভাবই ছিল। তবু এমন একটা নিরীহ লোকের উপর বাড়ীশুদ্ধ সকলের এত বড় অন্যায়-অবহেলায় আমার গা যেন জ্বলে যেতে লাগ্‌লো।

বাড়ীতে গরুর দুধ বড় কম হ'ত না। কিন্তু তাঁর পাতে কোন দিন বা একটু পড়্‌ত, কোন দিন পড়্‌ত না। হঠাৎ একদিন সইতে না পেরে ব'লে ফেলেছিলুম আর কি! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, ছি, ছি, কি নির্লজ্জাই আমাকে তা হ'লে এরা মনে করৃত। তা ছাড়া এরা সব আপনার লোক হয়েও যদি দয়া-মায়া না করে, আমারই বা এত মাথা-ব্যথা কেন? আমি কোথাকার কে? পর বই ত না।

দিন-পাঁচ-ছয় পরে একদিন সকালবেলা রান্নাঘরে ব'সে মেজ-ঠাকুর-পোর জন্যে চা তৈরি করৃচি, স্বামীর কণ্ঠস্বর আমার কাণে গেল। তাঁর সকালেই কোথায় বা'র হবার দরকার ছিল, ফিরৃতে দেরি হবে, মাকে ডেকে বল্‌লেন, "কিছু খেয়ে গেলে বড় ভাল হ'ত, মা, খাবার-টাবার কিছু আছে?"

মা বল্‌লেন, "অবাক্ করৃলে ঘনশ্যাম! এত সকালে খাবার পাব কোথায়?"

স্বামী বল্‌লেন, "তবে থাক্, ফিরে এসেই খাবো।" ব'লে চ'লে গেলেন।

সেদিন আমি কিছুতেই আপনাকে আর সাম্‌লাতে পারৃলুম না। আমি জান্‌তুম, ও-পাড়ার বোসেরা তাদের বেয়াই-বাড়ীর পাওয়া সন্দেশ রসগোল্লা পাড়ায় বিলিয়েছিল। কাল রাত্রে আমাদেরও কিছু দিয়েছিল।

শাশুড়ী ঘরে ঢুকতেই ব'লে ফেললুম, "কালকের খাবার কি কিছুই ছিল না মা ?"

তিনি একেবারে আকাশ থেকে প'ড়ে বললেন, "খাবার আবার কে কিনে আনলে বউ-মা ?"

বললুম, "সেই যে বোসেরা দিয়ে গিয়েছিল ?"

তিনি বললেন, "ও মা, সে আবার ক'টা যে, আজ সকাল পর্য্যন্ত থাকবে ? সে ত কালই শেষ হয়ে গেছে।"

বললুম, "তা ঘরেই কি কিছু খাবার তৈরী ক'রে দেওয়া যেত না মা ?"

শাশুড়ী বললেন, "বেশ ত বৌমা, তাই কেন দিলে না ? তুমি ত ব'সে ব'সে সমস্ত শুনছিলে বাছা ?"

চুপ ক'রে রইলুম। আমার কি-ই বা বলবার ছিল। স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার টান ত আর বাড়ীতে কারো অবিদিত ছিল না।

চুপ ক'রে রইলুম সত্যি, কিন্তু ভেতরে মনটা আমার জ্বলতেই লাগল। দুপুরবেলা শাশুড়ী ডেকে বললেন, "খা'ব এস বউ-মা, ভাত বাড়া হয়েছে।"

বললুম, "আমি এখন খাব না মা, তোমরা খাও গে।"

আমার আজকের মনের ভাব শাশুড়ী লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, "খাবে না, কেন শুনি ?"

বললুম, "এখন ক্ষিদে নেই।"

আমার মেজ-জা আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিলেন। রান্না-ঘরের ভেতর থেকে ঠোকর দিয়ে ব'লে উঠলেন, "বটঠাকুরের খাওয়া না হ'লে বোধ হয় দিদির ক্ষিদে হবে না মা।"

শাশুড়ী বললেন, "তাই না কি বউ-মা ? বলি, এ নূতন ঢঙ শিখলে কোথায় ?"

তিনি কিছু মিথ্যে বলেন নি, আমার পক্ষে এ ঢঙই বটে, তবু খোঁটা সইতে পারলুম না, জবাব দিয়ে বসলুম, "নূতন হবে কেন মা, তোমাদের সময়ে কি এ রীতির চলন ছিল না? ঠাকুরদের খাবার আগেই কি খেতে?"

"তবু ভালো, ঘনশ্যামের এতদিনে কপাল ফিরল" ব'লে শাশুড়ী মুখখানা বিকৃত ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মেজ-জায়ের গলা কানে গেল। তিনি আমাকে শুনিয়েই বললেন, "তখনি ত বলেছিলুম মা! বুড়ো শালিক পোষ মানবে না।"

রাগ ক'রে ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু এইবার সমস্ত জিনিসটা মনে মনে আলোচনা ক'রে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল। কেবলই মনে হ'তে লাগল, তাঁর খাওয়া হয় নি ব'লে খাইনি, তাঁর কথা নিয়ে ঝগড়া করেছি, ফিরে এসে, এ সব যদি তাঁর কাণে যায়? ছি ছি! কি ভাববেন তিনি! আমার এতদিনের আচরণের সঙ্গে এ ব্যবহার এমনি বিসদৃশ, খাপছাড়া যে, নিজের লজ্জাতেই নিজে ম'রে যেতে লাগলুম।

কিন্তু বাঁচলুম, ফিরে এলে এ কথা কেউ তাঁকে শোনালে না।

সত্যিই বাঁচলুম, এর এক বিন্দু মিছে নয়। কিন্তু আচ্ছা—একটা কথা যদি বলি, তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে কি? যদি বলি, সে রাত্রে পরিশ্রান্ত স্বামী শয্যার উপর ঘুমিয়ে রইলেন, আর নীচে যতক্ষণ না আমার ঘুম এল, ততক্ষণ ফিরে ফিরে কেবলই সাধ হ'তে লাগল, কেউ যদি কথাটা ওঁর কাণে তুলে দিত, অভুক্ত স্বামীকে ফেলে আজ আমি কিছুতে খাইনি, এই নিয়ে ঝগড়া করেছি, তবু মুখ বুজে এ অন্যায় সহ্য করিনি—কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে কি? না হ'লে তোমাদের দোষ দেব না, হ'লে বহু ভাগ্য বলে মানব। আজ আমার স্বামীর বড় ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই, তাঁর নাম নিয়ে বলছি, মানুষের মন-পদার্থ-টার

যে অন্ত নেই, সেই দিন তার আভাষ পেয়েছিলুম। এত বড় পাপিষ্ঠার মনের মধ্যেও এমন ছ'টো উল্‌টো স্রোত একসঙ্গে ব'য়ে যাবার স্থান হ'তে পারে দেখে, তখন অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম!

মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লুম, এ যে বড় লজ্জার কথা! নইলে এখুনি ঘুম থেকে জাগিয়ে ব'লে দিতুম, শুধু সৃষ্টিছাড়া ভালোমানুষ হ'লেই হয় না, কর্ত্তব্য করতে শেখাও দরকার। যে স্ত্রীর তুমি একবিন্দু খবর নাও না, সে তোমার জন্য কি করেচে, একবার চোখ মেলে দেখ। হা রে পোড়া কপাল! খদ্যোৎ চায় সূর্য্যদেবকে আলো ধ'রে পথ দেখাতে। তাই বলি, হতভাগীর স্পর্দ্ধার কি আর আদি-অন্ত দাওনি ভগবান্!

গরমের জন্য কি না বলতে পারিনে, ক'দিন ধ'রে প্রায়ই মাথা ধর্‌ছিল! দিন-পাঁচেক পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্ ক'রে কখন্ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হচ্ছিল, কে পাশে ব'সে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করচে। একবার ঠক্ ক'রে গায়ে পাখাটা ঠেকে যেতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে আলো জ্বল্‌ছিল, চেয়ে দেখ্‌লুম স্বামী!

রাত জেগে ব'সে পাখার বাতাস ক'রে আমাকে ঘুম পাড়াচ্চেন!

হাত দিয়ে পাখাটা ধ'রে ফেলে বল্‌লুম, "এ তুমি কি করচ!"

তিনি বল্‌লেন, "কথা কইতে হবে না, ঘুমোও, জেগে থাক্‌লে মাথাধরা ছাড়্‌বে না।"

আমি বল্‌লুম, "আমার মাথা ধ'রেছে, কে তোমাকে বল্‌লে?"

তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, "কেউ বলেনি; আমি হাত গুণ্‌তে জানি। কারো মাথা ধ'র্‌লেই টের পাই।"

বল্‌লুম, "তা হ'লে ত অন্য দিনও পেয়েছ বল? মাথা ত শুধু আমার আজই ধরেনি।"

তিনি আবার একটু হেসে বল্‌লেন, "রোজই পেয়েছি। কিন্তু এখন একটু ঘুমোবে, না, কথা কবে?"

বললুম, "মাথাধরা আমার ছেড়ে গেছে, আর ঘুমোবো না।"

তিনি বললেন, "তবে সবুর কর, ওষুধটা তোমার কপালে লাগিয়ে দিই," বলে উঠে গিয়ে কি একটা নিয়ে এসে ধীরে ধীরে আমার কপালে ঘ'ষে দিতে লাগলেন! আমি ঠিক ইচ্ছে ক'রেই যে করলুম, তা নয়, কিন্তু আমার ডান-হাতটা কেমন ক'রে তাঁর কোলের ওপর গিয়ে পড়তেই তিনি একটা হাত দিয়ে সেটা চেপে ধ'রে রাখলেন। হয় ত একবার একটু জোর ক'রেও ছিলুম। কিন্তু জোর আপনিই কোথায় মিলিয়ে গেল। দুরন্ত ছেলেকে মা যখন কোলে টেনে নিয়ে জোর ক'রে ধ'রে রাখেন, তখন, বাইরে থেকে হয় ত সেটাকে একটুখানি অত্যাচারের মতও দেখায়, কিন্তু সে অত্যাচারের মধ্যে শিশুর ঘুমিয়ে পড়তে বাধে না। বাইরের লোক যাই বলুক, শিশু বোঝে, ওইটেই তার সব চেয়ে নিরাপদ স্থান। আমার এই জড়পিণ্ড হাতটারও বোধ করি সেই জ্ঞানই ছিল, নইলে কি কোরে সে টের পেলে, নিশ্চিন্ত-নির্ভরে প'ড়ে থাকবার এমন আশ্রয় তার আর নেই।

তার পর তিনি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলোতে লাগলেন, আমি চুপ ক'রে প'ড়ে রইলুম। আমি এর বেশি আর বোলব না। আমার সেই প্রথম রাত্রির আনন্দ-স্মৃতি—সে আমার, একেবারে আমারই থাক্।

কিন্তু আমি ত জানতুম, ভালবাসার যা কিছু, সে আমি শিখে এবং শেষ ক'রে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী এসেছি। কিন্তু সে শেখা যে ডাঙায় হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার শেখার মত ভুল-শেখা, এই সোজা কথাটা সেদিন যদি টের পেতাম! স্বামীর কোলের ওপর থেকে আমার হাতখানা যে তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে শোষণ ক'রে এই কথাটাই আমার বুকের ভেতর পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছিল, এই কথাটাই যদি সেদিন আমার কাছে ধরা পড়ত!

সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখ্‌লুম, স্বামী ঘরে নেই, কখন্ উঠে গেছেন। হঠাৎ মনে হ'ল, স্বপন দেখিনি ত? কিন্তু চেয়ে দেখি, সেই ওষুধের শিশিটা তখনও শিয়রের কাছে রয়েছে। কি যেন মনে হ'ল, সেটা বার বার মাথায় ঠেকিয়ে তবে কুলুঙ্গিতে রেখে বাইরে এলুম।

শাশুড়ী-ঠাকরুণ সেই দিন থেকে আমার ওপব যে কড়া নজর রাখ্‌ছিলেন, সে আমি টের পেতুম। আমিও ভেবেছিলুম, মরুক্ গে, আমি কোন কথায় আর থাক্‌ব না। তা'ছাড়া দু'দিন আস্‌তে না আস্‌তে স্বামীর খাওয়া-পরা নিয়ে ঝগড়া,—ছি ছি, লোকে শুন্‌লেই বা বল্‌বে কি?

কিন্তু কবে যে এর মধ্যেই আমার মনের ওপর দাগ প'ড়ে গিয়েছিল, কবে যে তাঁর খাওয়া-পরা নিয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হ'য়ে উঠেছিলুম, সে আমি নিজেই জান্‌তুম না। তাই, দু'টো দিন যেতে-না-যেতেই আবার একদিন ঝগড়া ক'রে ফেল্‌লুম।

আমার স্বামীর কে একজন আড়ৎদার বন্ধু সেদিন সকালে মস্ত একটা রুইমাছ পাঠিয়েছিলেন। স্নান কর্‌তে পুকুরে যাচ্ছি, দেখি, বারান্দার ওপর সবাই জড় হয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। কাছে এসে দাঁড়ালুম, মাছ কোটা হয়ে গেছে। মেজ-জা তরকারী কুট্‌চেন, শাশুড়ী ব'লে ব'লে দিচ্ছেন;—এটা মাছের ঝোলের কুট্‌নো,—ওটা মাছের ডালনার কুট্‌নো ওটা মাছের অম্বলের কুট্‌নো, এমনি সমস্তই প্রায় আঁসরান্না। আজ একাদশী—তাঁর এবং বিধবা মেয়ের খাবার হাঙ্গামা নেই, কিন্তু আমার স্বামীর জন্য কোন ব্যবস্থাই দেখ্‌লুম না। তিনি বৈষ্ণব-মানুষ, মাছ মাংস ছুঁতেন না। একটু ডা'ল, দু'টো ভাজাভুজি, একটুখানি অম্বল হ'লেই তাঁর খাওয়া হ'ত। অথচ, ভাল খেতেও তিনি ভালবাস্‌তেন। এক-আধ দিন একটু ভাল তরকারি হ'লে তাঁর আহ্লাদের সীমা থাক্‌ত না, তাও দেখেচি।

বল্‌লুম, "ওঁর জন্যে কি হ'চ্ছে মা ?"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "আজ আর সময় কৈ বউ-মা ? তার জন্যে দু'টো আলু-উচ্ছে ভাতে দিতে ব'লে দিয়েছি—তার পর একটু দুধ দেব'খন।"

বল্‌লুম,—"সময় নেই কেন মা ?"

শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, "দেখতেই ত পাচ্ছ বউ-মা। এতগুলো আঁস-রান্না হ'তেই ত দশটা—এগারটা বেজে যাবে। আজ আমার অখিলের (মেজ-দেবর) দু'চার জন বন্ধু-বান্ধব খাবে, তারা হ'ল সব অপিসার মানুষ, দশটার মধ্যে খাওয়া না হ'লে পিত্তি প'ড়ে সারাদিন আর খাওয়াই হবে না। এর ওপর আবার নিরিমিষ রান্না কর্‌তে গেলে ত রাঁধুনী বাঁচে না। তার প্রাণটাও ত দেখ্‌তে হবে বাছা !"

রাগে সর্ব্বাঙ্গ রি-রি ক'রে জ্বল্‌তে লাগল। তবু কোনমতে আত্ম-সংবরণ ক'রে বল্‌লুম, "শুধু আলু-উচ্ছে-ভাতে দিয়ে কি কেউ খেতে পারে মা ? একটুখানি ডাল রাঁধবারও কি সময় হ'ত না ?"

তিনি আমার মুখপানে কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে বল্‌লেন, "তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারিনে বাছা, আমার কাজ আছে।"

এতক্ষণ রাগ সাম্‌লেছিলুম, আর পার্‌লুম না। ব'লে ফেল্‌লুম, "কাজ সকলেরি আছে মা ! তিনি তিরিশ টাকার কেরাণী-গিরি করেন না ব'লে কুলি-মজুর ব'লে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল করতে পারো। কিন্তু আমি ত পারিনে ! আমি ওই দিয়ে তাঁকে খেতে দেব না। রাঁধুনী রাঁধ্‌তে না পারে, আমি যাচ্ছি।"

শাশুড়ী খানিকক্ষণ অবাক্‌ হ'য়ে আমার পানে চেয়ে থেকে বল্‌লেন, "তুমি ত কা'ল এলে বউ-মা, এতদিন তার কি ক'রে খাওয়া হ'ত শুনি ?"

বল্‌লুম, "সে খোঁজে আমার দরকার নেই। কিন্তু কা'ল এলেও আমি কচি খুকি নই মা। এখন থেকে সে সব হ'তে দিতে পার্‌ব না।" রান্না-ঘরে ঢুকে রাঁধুনীকে বল্‌লুম, "বড়বাবুর জন্য নিরামিষ ডাল-ডাল্‌না,

অম্বল হবে। তুমি না পারো, একটা উনুন ছেড়ে দাও, আমি এসে রাঁধ্‌চি", ব'লে আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না ক'রে স্নান কর্‌তে চ'লে গেলুম।

স্বামীর বিছানা আমি রোজ নিজের হাতেই কর্‌তুম। এই ধপ্‌ধপে শাদা বিছানাটির উপর ভেতরে ভেতরে আমার যে একটা লোভ জন্মাচ্ছিল, হঠাৎ এত দিনের পর আজ বিছানা কর্‌বার সময় সে কথা জান্‌তে পেরে, নিজের কাছেই যেন লজ্জায় ম'রে গেলুম!

ঘড়িতে বারোটা বাজ্‌তে তিনি শুতে এলেন। কেন যে এত রাত পর্য্যন্ত জেগে ব'সে বই পড়ছিলুম, তাঁর পায়ের শব্দ সে খবর আজ এমনি স্পষ্ট ক'রে আমার কাণে কাণে ব'লে দিলে যে, লজ্জায় মুখ তুলে চাইতেও পার্‌লুম না।

স্বামী বল্‌লেন, "এখনো শোওনি যে?"

আমি বই থেকে মুখ তুলে ঘড়ীর পানে তাকিয়ে যেন চম্‌কে উঠ্‌লুম—"তাই ত, বারোটা বেজে গেছে!"

কিন্তু, যিনি সব দেখতে পান, তিনি দেখেছিলেন, আমি পাঁচ মিনিট্‌ অন্তর ঘড়ী দেখেছি।

স্বামী শয্যায় ব'সে একটু হেসে বল্‌লেন, "আজ আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছিলে?"

বল্‌লুম, "কে বল্‌লে?"

তিনি বল্‌লেন, "সেদিন তোমাকে ত বলেছি, আমি হাত গুণ্‌তে জানি।"

বল্‌লুম, "জান্‌লে ভালই! কিন্তু, তোমার গোয়েন্দার নাম না বল, তিনি কি কি দোষ আমার দিলেন শুনি?"

তিনি বল্‌লেন, "গোয়েন্দা দোষ দেয়নি, কিন্তু আমি দিচ্ছি। আচ্ছা জিজ্ঞেস করি, এত অল্পে তোমার এত রাগ হয় কেন?"

বল্‌লুম, "অল্প ? তুমি কি ভাবো, তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বাট্‌খারা দিয়েই সকলের ওজন চল্‌বে ? কিন্তু তা'ও ব'ল্‌ছি, তুমি যে এত বল্‌চ, এ অত্যাচার চোখে দেখ্‌লে তোমারও রাগ হ'ত।"

তিনি আবার একটু হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হ'তে বলেছেন, আর তোমাকে এখন থেকে তাই হ'তে হবে।"

"কেন আমার অপরাধ ?"

"বৈষ্ণবের স্ত্রী, এই মাত্র তোমার অপরাধ।"

বল্‌লুম, "তা হ'তে পারে, কিন্তু, গাছের মত অন্যায় সহ্য করা আমার কাজ নয়, তা সে যে প্রভুই আদেশ করুন। তা ছাড়া, যে লোক ভগবান্ পর্য্যন্ত মানে না, তার কাছে আবার মহাপ্রভু কি ?"

স্বামী হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠলেন, বল্‌লেন, "কে ভগবান্ মানে না ? তুমি ?"

বল্‌লুম, "হাঁ আমি।"

তিনি বল্‌লেন, "ভগবান্ মান না কেন ?"

বল্‌লুম, "নেই ব'লে মানিনে। মিথ্যে ব'লে মানিনে।"

আমি লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌ছিলুম, আবার স্বামীর হাসি মুখখানি ধীরে ধীরে ম্লান হ'য়ে আস্‌ছিল, এই কথার পর সে মুখ একেবারে যেন ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে বল্‌লে, "শুনেছিলুম তোমার মামা নাকি নিজেকে নাস্তিক বল্‌তেন—"

আমি মাঝখানেই ভুল শুধ্‌রে দিয়ে বল্‌লুম,—"না, তিনি নিজেকে নাস্তিক বল্‌তেন না, "Agnostic বল্‌তেন—"

স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "সে আবার কি ?"

আমি বল্‌লুম, "Agnostic তারা, যারা ঈশ্বর আছেন বা নেই—কোন কথাই বলে না।"

কথাটা শেষ না হ'তেই স্বামী ব'লে উঠলেন, "থাক্, এ সব আলোচনা। আমার সাম্‌নে তুমি কোন দিন আর এ কথা মুখে এনো না।"

তবু তর্ক কর্‌তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু, হঠাৎ তাঁর মুখপানে চেয়ে আর আমার মুখে কথা যোগাল না। ভগবানের ওপর তাঁর অচল বিশ্বাস আমি জান্‌তুম, কিন্তু কোন মানুষ যে আর একজনের মুখ থেকে তাঁর অস্বীকার শুন্‌লে এত ব্যথা পেতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। এই নিয়ে মামার বস্‌বার ঘরে অনেক তর্ক নিজেও করেছি, অপরকেও কর্‌তে শুনেছি, রাগারাগি হ'য়ে যেতে বহুবার দেখেচি, কিন্তু এমন বেদনায় বিবর্ণ হ'য়ে যেতে কাউকে দেখিনি। আমি নিজেও ব্যথা বড় কম পেলুম না, কোন তর্ক না ক'রে এ ভাবে আমার মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়ায় অপমানে আমার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। কিন্তু ভাবি, আমার অপমানের পালাটা এর ওপর দিয়েই কেন সেদিন শেষ হ'ল না।

যে মাদুরটা পেতে আমি নীচে শুতুম, সেটা ঘরের কোণে গুটানো থাক্‌ত; আজ কে সরিয়ে রেখেছিল, বল্‌তে পারিনে। খুঁজে পাচ্ছিনে দেখে, তিনি নিজে বিছানা থেকে একটা তোষক তুলে বল্‌লেন, "আজ এইটে পেতে শোও! এত রাত্রে কোথা আর খুঁজে বেড়াবে বল।"

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের লেশমাত্র ছিল না। তবুও কথাটা যেন অপমানের শূল হ'য়ে আমার বুকে বিঁধিল। রোজ ত আমি নীচে শুই। সামান্য একখানা মাদুর পেতে যেমন তেমন ভাবে রাত্রি যাপন করাটাই ত ছিল আমার সব চেয়ে বড় গর্ব্ব। কিন্তু স্বামীর ছোট্ট দু'টি কথায় যে আজ আমার সেই গর্ব্ব ঠিক তত বড় লাঞ্ছনায় রূপান্তরিত হ'য়ে দেখা দেবে, এ কে ভেবেছিল?

অন্যত্র শোবার উপকরণ স্বামীর হাত থেকেই হাত পেতে নিলুম, কিন্তু শোবামাত্রই কান্নার ঢেউ যেন আমার গলা পর্য্যন্ত ফেনিয়ে উঠ্‌ল।

জানিনে তিনি শুন্‌তে পেয়েছিলেন কি না। সকাল হ'তে না হ'তেই তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করছি, তিনি ডেকে বল্‌লেন, "আজ এত ভোরে উঠ্‌লে যে?"

বল্‌লুম, "ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই বাইরে যাচ্ছি।"

বল্‌লেন, "একটা কথা আমার শুন্‌বে?"

রাগে-অভিমানে সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে গেল, বল্‌লুম, "তোমার কথা কি আমি শুনিনি?"

আমার মুখপ্রানে চেয়ে তিনি একটু হেসে বল্‌লেন, "শোন; আচ্ছা, তাহ'লে কাছে এস, বলি।"

বল্‌লুম, "আমি ত কালা নই, এখানে দাঁড়িয়েই শুন্‌তে পাব।"

"পাবে না গো, পাবে না," বলেই তিনি হঠাৎ সুমুখে ঝুঁকে পড়ে আমার হাতটা ধরে ফেল্‌লেন। আমি জোর ক'রে ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু, তাঁর সঙ্গে পার্‌ব কেন, একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাত দিয়ে জোর ক'রে আমার মুখ তুলে ধ'রে বল্‌লেন,"যারা ভগবান্ মানে তারা কি বলে জানো? তারা বলে, স্বামীর কাছে কিছুতেই মিথ্যে বল্‌তে নেই।"

আমি বল্‌লুম, "কিন্তু যারা ভগবান্ মানে না, তারা বলে, কারও কাছেই মিথ্যে বল্‌তে নেই।"

স্বামী হেসে বল্‌লেন, "বটে! কিন্তু তাই যদি হয়, অতবড় মিথ্যে কথাটা কাল কি ক'রে মুখে আন্‌লে বলত? কি ক'রে বল্‌লে ভগবান্ তুমি মানো না?"

হঠাৎ মনে হ'ল, এত আশা ক'রে বুঝি কেউ কখনো কারও সঙ্গে কথা কয়নি। তাই বল্‌তে মুখে বাধতে লাগল, কিন্তু তবু ত পোড়া অহঙ্কার গেল না, ব'লে ফেল্‌লুম "ভগবান্ মানি বল্‌লেই বুঝি সত্যি কথা বলা হ'ত? আমাকে আট্‌কে রাখ্‌লে কেন? আর কোন কথা আছে?"

তিনি ম্লানমুখে আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "আর একটা কথা—মায়ের কাছে আজ মাপ চেয়ো।"

আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠলো ; বল্‌লুম, "মাপ চাওয়াটা কি ছেলেখেলা, না, তার কোন অর্থ আছে ?"

স্বামী বল্‌লেন, "অর্থ তার এই যে, সেটা তোমার কর্ত্তব্য।"

বল্‌লুম, "তোমাদের ভগবান্ বুঝি বলেন, যে নিরপরাধ, সে গিয়ে অপরাধীর নিকট ক্ষমা চেয়ে কর্ত্তব্য করুক্ ?"

স্বামী আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন। তার পর ধীরে ধীরে বল্‌লেন, "ভগবানের নাম নিয়ে তামাসা কর্‌তে নেই, এ কথা ভবিষ্যতে কোন দিন আর যেন মনে ক'রে দিতে আমায় না হয়। আমি তর্ক কর্‌তে ভালবাসিনে—মায়ের কাছে মাপ চাইতে না পারো, তাঁর সঙ্গে আর কখনও বিবাদ কর্‌তে যেয়ো না।"

বল্‌লুম, "কেন, শুন্‌তে পাইনে ?"

তিনি বল্‌লেন, "না। নিষেধ করা আমার কর্ত্তব্য, তাই নিষেধ করে দিলুম।" এই বলে তিনি বাহিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি আর সইতে পার্‌লুম না, বল্‌লুম, "কর্ত্তব্যজ্ঞানটা তোমাদেরই যদি এত বেশি, সে কি আর কারও নেই ? আমিও ত মানুষ, বাড়ীর মধ্যে আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে। তা যদি তোমাদের ভাল না লাগে, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। থাক্‌লেই বিবাদ হবে, এ নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।"

তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "তাহ'লে গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ করাই বুঝি তোমার কর্ত্তব্য ? সে যদি হয়, যেদিন ইচ্ছে বাপের বাড়ী যাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই।"

স্বামী চ'লে গেলেন, আমি সেইখানে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়্‌লুম।

মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হ'ল, "হায় রে! যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর!"

সমস্ত সকালটা যে আমার কি ক'রে কাট্‌লো সে আমিই জানি। কিন্তু দুপুরবেলা স্বামীর মুখ থেকেই যে কথা শুন্‌লুম, তাতে বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

খেতে বসিয়ে শাশুড়ী বল্‌লেন, "কাল তোমাকে বলিনি বাছা, কিন্তু এ বউ নিয়ে ত আর ঘর করতে পারিনে ঘনশ্যাম! কালকের কাণ্ড ত শুনেছ?"

স্বামী বল্‌লেন, "শুনেচি মা!"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "তা হলে যা হোক্, এর একটা ব্যবস্থা কর।"

স্বামী একটুখানি হেসে বল্‌লেন, "ব্যবস্থা করার মালিক ত তুমি নিজেই মা।"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "তা কি আর পারিনে বাছা, একদিনেই পারি। এত বড় ধাড়ী মেয়ে, আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছে ছিল না। শুধু—"

স্বামী বল্‌লেন, "সে কথা ভেবে আর লাভ কি মা! আর ভালমন্দ যাই হোক্, বাড়ীর বড়-বৌকে ত আর ফেল্‌তে পার্‌বে না! ও চায় আমি একটু ভাল খাই-দাই। ভাল, সে ব্যবস্থাই কেন করে দাও না মা!"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "অবাক্ কর্‌লি ঘনশ্যাম। আমি কি ভালমন্দ খেতে দিতে জানিনে যে, আজ ও এসে আমাকে শিখিয়ে দেবে? আর তোমারই বা দোষ কি বাবা! অত বড় বৌ যেদিন এসেছে, সেই দিনই জান্‌তে পেরেচি, সংসার এবার ভাঙল। তা বাছা, আমার গিন্নিপনায় আর না যদি চলে, ওর হাতেই না হয় ভাঁড়ারের চাবি দিচ্চি। কৈ গা, বড়-বউ-মা, বেরিয়ে এসো গো, চাবি নিয়ে যাও"—ব'লে শাশুড়ী ঝনাৎ করে চাবির গোছা রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর ফেলে দিলেন।

স্বামী আর একটি কথাও কইলেন না; মুখ বুজে ভাত খেয়ে বাইরে

যাবার সময় বল্‌তে বল্‌তে গেলেন, "সব মেয়েমানুষের ঐ এক রোগ, কাকেই বা কি বলি !"

আমার বুকের মধ্যে যেন আহ্লাদের জোয়ার ডেকে উঠল। আমি কেন ঝগড়া করেচি, তা উনি জানতে পেরেছেন, এই কথাটা শতবার মুখে আবৃত্তি করে সহস্র রকমে মনের মধ্যে অনুভব ক'র্‌তে লাগলুম। সকালের সমস্ত কথা আমার যেন ধুয়ে মুছে গেল !

এখন কতবার মনে হয়, ছেলেবেলা থেকে কাজের অকাজের কত বই প'ড়ে কত কথাই শিখেছিলুম, কিন্তু এ কথাটা কোথাও যদি শিখতে পেতুম, পৃথিবীতে তুচ্ছ একটি কথা গুছিয়ে বল্‌বার দোষে, ছোট একটি কথা মুখ ফুটে না বল্‌বার অপরাধে, কত শত ঘর-সংসারই না ছারখার হয়ে যায়। হয় ত, তাহ'লে এ কাহিনী লেখবার আজ আবশ্যকই হ'ত না।

তাই ত বার বার বলি, ওরে হতভাগী ! এত শিখেছিলি, এটা শুধু শিখিস্‌নে, মেয়েমানুষের কার মানে মান! কার হতাদরে তোদের মানের অট্টালিকা তাসের অট্টালিকার মতই এক নিমিষে একটা ফুঁয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায় !

তবে, তোর কপাল পুড়্‌বে না ত পুড়্‌বে কার ! সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা ঘরে খিল দিয়ে যদি সাজ-সজ্জাই কর্‌লি, অসময়ে ঘুমের ভাণ করে যদি স্বামীর পালঙ্কের একধারে গিয়ে শুতেই পার্‌লি, তাঁকে একটা সাড়া দিতেই কি তোর এমন কণ্ঠরোধ হ'ল ? তিনি ঘরে ঢুকে দ্বিধায়, সঙ্কোচে বার বার ইতস্ততঃ ক'রে যখন বেরিয়ে গেলেন, একটা হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধরে ফেল্‌তেই কি তোর হাতে পক্ষাঘাত হ'ত ? সেই ত সারা-রাত্রি ধরে মাটীতে পড়ে পড়ে কাঁদ্‌লি, একবার মুখ ফুটে বল্‌তেই কি শুধু এত বাধা হ'ল যে, আচ্ছা, তুমি তোমার বিছানাতে এসে শোও, আমি আমার ভূমি-শয্যাতে না হয় ফিরে যাচ্ছি।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙল, মনে হ'ল যেন জ্বর হয়েচে। উঠে বাইরে যাচ্চি, স্বামী এসে ঘরে ঢুক্‌লেন। আমি মুখ নীচু ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি বল্‌লেন, "তোমাদের গ্রামের নরেনবাবু এসেছেন।"

বুকের ভেতরটায় ধক্ ক'রে উঠ্‌ল!

স্বামী বল্‌তে লাগলেন, "আমাদের নিখিলের তিনি কলেজের বন্ধু। চিতোর বিলে হাঁস শীকার করবার জন্য কল্‌কাতায় থাকৃতে সে বুঝি কবে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছিল, তাই এসেছেন। তুমিও তাঁকে বেশ চেনো, না?"

উঃ—মানুষের স্পর্দ্ধার কি একটা সীমা থাক্‌তে নেই!

ঘাড় নেড়ে জানালুম, আছে। কিন্তু, ঘৃণায়-লজ্জায় নখ থেকে চুল পর্য্যন্ত আমার তেতো হ'য়ে গেল।

স্বামী বল্‌লেন, "তোমার প্রতিবেশীর আদর-যত্নের ভার তোমাকেই নিতে হবে।"

শুনে এম্‌নি চম্‌কে উঠলুম যে, ভয় হ'ল, হয় ত আমার চমকটা তাঁর চোখে প'ড়েচে। কিন্তু এদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বল্‌লেন, "কা'ল রাত্রি থেকেই মায়ের বাতটা ভয়ানক বেড়েচে। এদিকে নিখিলও বাড়ী নেই, অখিলকেও তার আফিস্ করতে হবে।"

মুখ নীচু কোরে কোন মতে বল্‌লুম, "তুমি?"

"আমার কিছুতেই থাক্‌বার যো নেই। রায়গঞ্জে পাট কিনতে না গেলেই নয়।"

"কখন ফির্‌বে?"

"ফির্‌তে আবার কা'ল এই সময়। রাত্রিটা সেখানেই থাকতে হবে।"

"তা' হলে আর কোথাও তাঁকে যেতে বল। আমি বউ-মানুষ, শ্বশুরবাড়ীতে তাঁর সাম্‌নে বা'র হ'তে পার্‌ব না।"

স্বামী বল্‌লেন, "ছি তা কি হয়! আমি সমস্ত ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্চি, তুমি সাম্‌নে না বা'র হও, আড়াল থেকে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ো।" এই ব'লে তিনি বাইরে চ'লে গেলেন।

সেই দিন পাঁচ মাস পরে আবার নরেনকে দেখলুম। দুপুরবেলা সে খেতে ব'সেছিল, আমি রান্নাঘরের দোরের আড়ালে ব'সে কিছুতেই চোখের কৌতূহল থামাতে পার্‌লুম না। কিন্তু চাইবামাত্রই আমার সমস্ত মনটা এমন একপ্রকার বিতৃষ্ণায় ভ'রে গেল যে, সে পরকে বোঝানো শক্ত। মস্ত একটা তেঁতুলবিছে এঁকেবেঁকে চ'লে যেতে দেখলে সর্ব্বাঙ্গ যেমন ক'রে ওঠে, অথচ যতক্ষণ সেটা দেখা যায়, চোখ ফিরুতে পারা যায় না, ঠিক তেমনি কোরেই আমি নরেনের পানে চেয়ে রইলুম। ছি, ছি, ওর ওই দেহটাকে কি কোরে যে একদিন ছুঁয়েছি, মনে পড়তেই সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়ে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার খাড়া হয়ে উঠ্‌ল।

খেতে খেতে সে মাঝে মাঝে চোখ তুলে চারিদিকে কি যে খুঁজ্‌ছিল, সে আমি জানি। আমাদের রাঁধুনী কি একটা তরকারি দিতে গেলে, সে হঠাৎ যেন ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "হাঁ গা, তোমাদের বড়-বৌ যে বড় বেরুলো না?"

রাঁধুনী জানত যে, ইনি আমাদের বাপের বাড়ীর লোক—গ্রামের জমীদার। তাই বোধ করি খুসী করবার জন্যই হাসির ভঙ্গীতে একঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে তার মন যোগালে। বল্‌লে, "কি জানি বাবু, বড় বৌ-মার ভারি লজ্জা—নইলে তিনিই ত আপনার জন্য আজ নিজে রাঁধলেন। রান্নাঘরে ব'সে তিনিই ত আপনার সব খাবার এগিয়ে গুছিয়ে দিচ্চেন। লজ্জা কোরে কিন্তু কম-যম খাবেন না বাবু, তা'হলে তিনি বড় রাগ করবেন, আমাকে ব'লে দিলেন।"

মানুষের শয়তানীর অন্ত নেই, দুঃসাহসেরও অবধি নেই। সে স্বচ্ছন্দে স্নেহের হাসিতে মুখখানা রান্নাঘরের দিকে তুলে চেঁচিয়ে বল্‌লে, "আমার

কাছে তোর আবার লজ্জা কিরে সদু? আয় আয়, বেরিয়ে আয়। অনেক দিন দেখিনি, একবার দেখি।"

কাঠ হ'য়ে সেই দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার মেজ-জা'ও রান্নাঘরে ছিল, ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে, "দিদির সবতাতেই বাড়াবাড়ি। পাড়ার লোক, ভাইয়ের মত—বিয়ের দিন পর্য্যন্ত সাম্‌নে বেরিয়েচ, কথা কয়েচ, আর আজই যত লজ্জা! একবার দেখ্‌তে চাচ্চেন, যাও না।"

এর আর জবাব দেব কি?

বেলা তখন দু'টো-আড়াইটে, বাড়ীর সবাই যে যার ঘরে শুয়েচে, চাকরটা এসে বাইরে থেকে বল্‌লে, "বাবু পাণ চাইলেন মা।"

"কে বাবু?"

"নরেনবাবু।"

"তিনি শীকার কর্‌তে যান্‌নি?"

"কই না, বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন যে।"

তা'হলে শীকারের ছলটাও মিথ্যে!

পাণ পাঠিয়ে দিয়ে জানালায় এসে বস্‌লুম। এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত এই জানালাটিই ছিল সব চেয়ে আমার প্রিয়। নীচেই ফুল-বাগান, এক ঝাড় চামেলী ফুলের গাছ দিয়ে সম্মুখটা ঢাকা; এখানে বস্‌লে বাইরের সমস্ত দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

আমি মানুষের মনের এই বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখি যে, যে বিপদ্‌টা হঠাৎ তার ঘাড়ে এসে পড়ে' তাকে একান্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন ক'রে দিয়ে যায়, অনেক সময়ে সে তাকেই একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা তুচ্ছ কথা চিন্তা করতে ব'সে যায়। বাইরে পাণ পাঠিয়ে দিয়ে আমি নরেনের কথাই ভাবতে বসেছিলুম সত্যি, কিন্তু, কখন কোন্ ফাঁকে যে আমার স্বামী এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে' ব'সে গিয়েছিলেন, সে আমি টেরও পাইনি।

আমার স্বামীকে আমি যত দেখ্‌ছিলুম, ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিলুম। সব চেয়ে আশ্চর্য্য হতুম—তাঁর ক্ষমা কর্‌বার ক্ষমতা দেখে। আগে আগে মনে হ'ত, এ তাঁর দুর্ব্বলতা, পুরুষত্বের অভাব। শাসন কর্‌বার সাধ্য নেই ব'লেই ক্ষমা করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই টের পাচ্ছিলুম, যেমন বুদ্ধিমান্ তেমনি দৃঢ়। আমাকে যে তিনি ভেতরে ভেতরে কত ভালবেসেছেন, সে ত আমি অসংশয়ে অনুভব কর্‌তে পারি, কিন্তু সে ভালবাসার ওপর এতটুকু জোর খাটাবার সাহস আমার ত হয় না।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলুম, "আচ্ছা, তুমিই বাড়ীর সর্ব্বস্ব, কিন্তু তোমাকে যে বাড়ীশুদ্ধ সবাই অযত্ন-অবহেলা ক'রে, এমন কি অত্যাচার করে, এ কি তুমি ইচ্ছা কর্‌লে শাসন ক'রে দিতে পার না?"

তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "কৈ, কেউ ত অযত্ন করে না।"

কিন্তু আমি নিশ্চয় জান্‌তুম, কিছুই তাঁর অবিদিত ছিল না।

বল্‌লুম, "আচ্ছা, যত বড় দোষই হোক, তুমি কি সব মাপ কর্‌তে পারো?"

তিনি তেম্‌নি হাসিমুখে বল্‌লেন, "যে সত্যি ক্ষমা চায়, তাকে করতেই হবে—এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো!"

তাই এক-একদিন চুপ ক'রে বসে ভাবতুম, ভগবান যদি সত্যিই নেই, তা' হলে এত শক্তি, এত শান্তি, ইনি পেলেন কোথায়? এই যে আমি স্ত্রীর কর্ত্তব্য একদিনের জন্যে করিনে, তবু ত তিনি কোন দিন স্বামীর জোর নিয়ে আমার অমর্য্যাদা অপমান করেন না?

আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি শ্বেত-পাথরের গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ছিল, আমি কত রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি, স্বামী বিছানার উপর স্তব্ধ হয়ে ব'সে একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে আছেন, আর দু'চক্ষু ব'য়ে অশ্রুর ধারা ব'য়ে যাচ্ছে। সময়ে সময়ে তাঁর মুখ দেখে আমারও যেন কান্না আস্‌ত, মনে হ'ত, অম্‌নি ক'রে একটা দিনও কাঁদ্‌তে পার্‌লে বুঝি মনের অর্দ্ধেক বেদনা

কমে যাবে। পাশের কুলুঙ্গিতে তাঁর খানকয়েক বড় আদরের বই ছিল, তাঁর দেখাদেখি আমিও মাঝে মাঝে পড়তুম। লেখাগুলো যে আমি সত্যি ব'লে বিশ্বাস কর্‌তুম, তা নয়, তবুও এমন কত দিন হয়েছে, কখন্ পড়ায় মন লেগে গেছে, কখন্ বেলা ব'য়ে গেছে, কখন্ দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গালের উপর শুকিয়ে আছে, কিছুই ঠাওর পাইনি। কত দিন হিংসে পর্য্যন্ত হয়েছে, তাঁর মত আমিও যদি এগুলি সমস্ত সত্যি ব'লেই ভাবতে পার্‌তুম!

কিছু দিন থেকে আমি বেশ টের পেতুম, কি একটা ব্যথা যেন প্রতিদিনই আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠ্‌ছিল। কিন্তু, কেন কিসের জন্যে, তা' কিছুতে হাতড়ে পেতুম না। শুধু মনে হ'ত, আমার যেন কেউ কোথাও নেই। ভাব্‌তুম, মায়ের জন্যেই বুঝি ভেতরে ভেতরে মন কেমন করে, তাই কত দিন ঠিক করেচি, কালই পাঠিয়ে দিতে বোল্‌ব, কিন্তু যাই মনে হ'ত, এই ঘরটি ছেড়ে আর কোথাও যাচ্চি, অম্‌নি সমস্ত সঙ্কল্প কোথায় যে ভেসে যেত, তাকে মুখ ফুটে বলাও হ'ত না।

মনে কর্‌লুম, যাই, কুলুঙ্গি থেকে বইখানা এনে একটু পড়ি। আজ-কাল এই বইখানি হয়েছিল আমার অনেক দুঃখের সান্ত্বনা। কিন্তু উঠ্‌তে গিয়ে হঠাৎ আঁচলে একটা টান পড়তেই ফিরে চেয়ে নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস হ'ল না। দেখি, আমার আঁচল ধ'রে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন। একটু হলেই চেঁচিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! সে কখন এসেচে, কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই জান্‌তে পারিনি। কিন্তু কি ক'রে যে সেদিন আপনাকে সাম্‌লে ফেলেছিলুম, আমি আজও ভেবে পাইনে। ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "এখানে এসেচ কেন? শীকার কর্‌তে?"

নরেন বল্‌লে, "বোস, বল্‌চি।"

আমি জানালার ওপর বসে পড়ে বল্‌লুম, "শীকার কর্‌তে যাওনি কেন?"

নরেন বল্‌লে, “ঘনশ্যামবাবুর হুকুম পাইনি। যাবার সময় ব'লে গেলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ী থেকে জীবহত্যা করা নিষেধ।”

চক্ষের নিমেষে স্বামী-গর্ব্বে আমার বুকখানা ফুলে উঠ্‌ল। তিনি কোন কর্ত্তব্যই ভোলেন না, সেদিকে তাঁর একবিন্দু দুর্ব্বলতা নেই! মনে মনে ভাবলুম, এ লোকটা দেখে যাক, আমার স্বামী কত বড়!

বল্‌লুম, “তাহ'লে বাড়ী ফিরে গেলে না কেন?”

সে লোকটা গরাদের ফাঁক দিয়ে খপ্ ক'রে আমার হাতটা চেপে ধরে বল্‌লে, “সদু, টাইফয়েড জ্বরে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে উঠে যখন শুন্‌লুম, তুমি পরের হয়েচ, আর আমার নেই, তখন বার বার ক'রে বল্‌লুম, ভগবান্, আমাকে বাঁচালে কেন? তোমার কাছে আমি এইটুকু বয়সের মধ্যে এমন কি পাপ করেচি—যার শাস্তি দেবার জন্য আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লে।”

বল্‌লুম, “তুমি ভগবান্ মানো?”

নরেন থতমত খেয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, “না—হাঁ—না, মানিনে, কিন্তু সে সময়ে কি জানো—”

“থাক্ গে—তার পরে?”

নরেন ব'লে উঠ্‌ল, “উঃ—সে আমার কি দিন, যেদিন শুন্‌লুম, তুমি আমারই আছো,—শুধু নামেই অন্যের, নইলে আমারই চিরকাল, শুধু আমারই! আজও একদিনের জন্যে আর কারও শয্যায় রাত্রি—”

“ছি ছি, চুপ করো! কিন্তু কে তোমাকে এ খবর দিলে? কার কাছে শুন্‌লে।”

“তোমাদের যে দাসী তিন চার দিন হ'ল বাড়ী যাবার নাম ক'রে চলে গেছে, যে—”

“মুক্ত কি তোমার লোক ছিল?” ব'লে জোর ক'রে তার হাত ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু, এবারেও সে তেম্‌নি সজোরে ধ'রে রাখ্‌লে। তার

চোখ দিয়ে ফোঁটা-দুই জলও গড়িয়ে পড়ল। বল্‌লে, "সদু, এমনি কোরেই কি আমাদের জীবনের শেষ হবে? অমন অসুখে না পড়্‌লে আজ কেউ ত আমাদের আলাদা ক'রে রাখ্‌তে পারৃত না! যে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্য কেন এত বড় শাস্তি ভোগ করৃব? লোকে ভগবান্, ভগবান্ করে, কিন্তু তিনি সত্যি থাকৃলে কি বিনা-দোষে এতবড় সাজা আমাদের দিতেন? কথখ না। তুমিই বা কিসের জন্যে একজন অজানা-অচেনা, মুখ্যু লোকের—"

"থাক্, থাক্; ও কথা থাক্।"

নরেন চম্‌কে উঠে বল্‌লে, "আচ্ছা, থাক্, কিন্তু যদি জান্‌তুম, তুমি সুখে আছ, সুখী হয়েচ, তা হলে হয় ত একদিন মনকে সান্ত্বনা দিতে পারৃতুম, কিন্তু, কোন সম্বলই যে আমার হাতে নেই—আমি বাঁচব কি কোরে?"

আবার তার চোখে জল এসে পড়ল। এবার সে আমার হাতটাই টেনে নিয়ে তার নিজের চোখের জল মুছে বল্‌লে, "এমন কোন সভ্যদেশ পৃথিবীতে আছে—যেখানে এত বড় অন্যায় হ'তে পারৃত! মেয়েমানুষ ব'লে কি তার প্রাণ নেই, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন ক'রে তাকে সারাজীবন দগ্ধ করৃবার অধিকার সংসারে কার আছে? কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছে করৃলে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে যেখানে খুসি চ'লে যেতে না পারে?"

এ সব কথা আমি সমস্তই জান্‌তুম। আমার মামার ঘরে নব্য যুগের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কোন আলোচনাই বাকি ছিল না। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুল্‌তে লাগল। বল্‌লুম, "তুমি আমাকে কি করৃতে বল?"

নরেন বল্‌লে, "আমি তোমাকে কোন কথাই বলৃব না। এইটুকু শুধু জানিয়ে যাবো যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পর্য্যন্ত আমি এই

আজকের দিনের প্রতীক্ষা ক'রেই পথ চেয়েছিলুম। তার পরে হয় ত একদিন শুন্‌তে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেচি, তার কাছেই ফিরে চ'লে গেছি। কিন্তু তোমায় কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল, সদু, বেঁচে থাক্‌তে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে যেন ঐ চোখের দু'কোঁটা জল পাই। আত্মা ব'লে যদি কিছু থাকে, তার তাতেই তৃপ্তি হবে।"

আমার হাতটা তার হাতের মধ্যেই রহিল—চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। এখন ভাবি, সেদিন যদি ঘূণাগ্রেও জান্‌তুম, মানুষের মনের দাম এই একেবারে উল্টো ধারায় বইয়ে দিতে এইটুকু মাত্র সময়, এইটুকু মাত্র মাল-মসলার প্রয়োজন, তা হ'লে যেমন কোরে হোক, সেদিন তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জানালা বন্ধ ক'রে দিতুম, কিছুতে তার একটা কথাও কাণে ঢুক্‌তে দিতুম না। ক'টা কথা, ক'-কোঁটা চোখের জলই বা তার খরচ হয়েছিল? কিন্তু নদীর প্রচণ্ড-স্রোতে পাতা শুদ্ধ শরগাছ যেমন কোরে কাঁপ্‌তে থাকে, তেম্‌নি কোরে আমার সমগ্র দেহটা কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, মনে হ'তে লাগ্‌ল, নরেন যেন কোন অদ্ভুত কৌশলে আমার পাঁচ আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে, পাঁচশ' বিদ্যুতের ধারা আমার সর্ব্বাঙ্গে বইয়ে দিয়ে, আমার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত অবশ ক'রে আন্‌চে। সেদিন মাঝখানের সেই লোহার গরাদেগুলো যদি না থাকৃত, আর সে যদি আমাকে টেনে তুলে নিয়ে পালাতো, হয় ত আমি একবার চেঁচাতে পর্য্যন্ত পার্‌তুম না—'ওগো, 'কে আছ, আমায় রক্ষা কর।' দু'জনে কতক্ষণ এমন স্তব্ধ হয়ে ছিলুম, জানিনে, সে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল, "সদু!"

"কেন?"

"তুমি ত বেশ জানো, আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়ে মানুষকে বেঁধে রাখ্‌বার শেকল মাত্র! যেমন কোরে হোক্, আট্‌কে রেখে তাদের

সেবা নেবার ফন্দি। সতীর মহিমা কেবল মেয়েমানুষের বেলা—পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি! আত্মা আত্মা যে করি, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই? তার কি স্বাধীন-সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্যে?"

"বউ-মা, বলি কথা কি তোমাদের শেষ হবে না বাছা?"

মাথার ওপর বাজ ভেঙে পড়লেও বোধ করি, মানুষে এমন কোরে চম্‌কে ওঠে না, আমরা দু'জনে যেমন কোরে চম্‌কে উঠ্‌লুম। নরেন হাত ছেড়ে দিয়ে ব'সে পড়্‌ল আমি মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লুম, বারান্দায় খোলা জানালার ঠিক সুমুখে দাঁড়িয়ে আমার শাশুড়ী।

বল্‌লেন, "বাছা, এ পাড়ার লোকগুলা ত তেমন সভ্য-ভব্য নয়, অমন কোরে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান্না-কাটি করতে দেখলে হয় ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত দেখ্‌তে শুন্‌তে সব দিকে বেশ হ'ত!"

কি একটা জবাব দিতে গেলুম, কিন্তু মুখের মধ্যে জিভটা আমার আড়ষ্ট হয়ে রইল—একটা কথাও ফুটল না।

তিনি একটুখানি হেসে বল্‌লেন, "বল্‌তে ত পারিনে, বাছা, শুধু ভেবেই মরি, বউ-মাটি কেন আমার এত কষ্ট স'য়ে মাটীতে শুয়ে থাকেন। তা' বেশ! বাবুটি নাকি দুপুরবেলা চা খান। চা তৈরীও হয়েছে—একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর দেখি, বউ-মা চায়ের পিয়ালাটা বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব, না, ঐ বাগানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাবেন?"

উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল চেষ্টায় তবে কথা কইতে পার্‌লুম, বল্‌লুম, "তুমি কি রোজ এম্‌নি কোরে আমার ঘরে আড়ি পাতো মা?"

শাশুড়ী মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "না, মা, সময় পাই কোথা? সংসারের কাজ ক'রেই ত সাম্‌তে পারিনে। এই দেখ না বাছা, বাতে মর্‌চি, তবু চা তৈরী কর্‌তে রান্নাঘরে ঢুক্‌তে হয়েছিল। তা এই ঘরেই না হয় পাঠিয়ে

দিচ্চি—বাবুটির আবার ভারি লজ্জার শরীর, আমি থাকৃতে হয় ত খাবেন না। তা যাচ্চি আমি—” ব'লে তিনি ফিক্ ক'রে একটু মুচ্‌কে হেসে চ'লে গেলেন। এম্‌নি মেয়েমানুষের বিদ্বেষ! প্রতিশোধ নেবার বেলায় শাশুড়ী-বধুর মান্য সম্বন্ধের কোন উঁচুনীচুর ব্যবধানই রাখ্‌লেন না।

সেইখানেই মেঝের ওপর চোখ বুজে শুয়ে পড়্‌লুম—সর্ব্বাঙ্গ ব'য়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে ঘাম ঝরে সমস্ত মাটীটা ভিজে গেল।

শুধু একটা সান্ত্বনা ছিল, আজ তিনি আস্‌বেন না,—আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ চুপ ক'রে থাকৃতে পাবো, তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

কতবার ভাবলুম উঠে বসি, কাজ কর্ম্ম করি—যেন কিছুই হয় নি—কিন্তু, কিছুতেই পার্‌লুম না, সমস্ত শরীর যেন থর্ থর্ কর্‌তে লাগলো!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এ ঘরে কেউ আলো দিতে এলো না।

রাত্রি তখন প্রায় আট্‌টা, সহসা তাঁর গলা বাইরে থেকে কাণে আস্‌তেই সমস্ত রক্ত-চলাচল যেন একেবারে থেমে গেল! তিনি চাকরকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন, “বঙ্কু, নরেনবাবু হঠাৎ চলে গেলেন কেন রে?” চাকরের জবাব শোনা গেল না। তখন নিজেই বল্‌লেন, “খুব সম্ভব শীকার কর্‌তে বারণ করেছিলুম ব'লে! তা উপায় কি!” অন্দরে ঢুক্‌তেই, শাশুড়ী-ঠাকরুণ ডেকে বল্‌লেন, “একবার আমার ঘরে এসো ত বাবা!”

তাঁর যে এক মুহূর্ত্ত দেরী সইবে না, সে আমি জান্‌তুম। তিনি যখন আমার ঘরে এলেন, আমি কিসের একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর-আঘাত প্রতীক্ষা করেই যেন সর্ব্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত ক'রে পড়ে রইলুম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বল্‌লেন না। কাপড়-চোপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বেরিয়ে গেলেন, যেন কিছুই হয়নি—শাশুড়ি তাঁকে যেন এইমাত্র একটা

কথাও বলে নি। তার পরে যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে তিনি ঘরে শুতে এলেন।

সারা-রাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও হ'ল না। সকালবেলা সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, মেজ-জা বললেন, "হেঁসেলে তোমার আর এসে কাজ নেই দিদি, আজ আমিই আছি!"

বললুম, "তুমি থাকলে কি আমাকে থাকতে নেই মেজদি'?"

"কাজ কি, মা কি জন্যে বারণ ক'রে গেলেন", ব'লে তিনি যে ঘাড় ফিরিয়ে টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, সে আমি স্পষ্ট টের পেলুম। মুখ দিয়ে আমার একটা কথাও বা'র হ'ল না—আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে এলুম।

দেখলুম, বাড়ীশুদ্ধ সকলের মুখ ঘোর অন্ধকার, শুধু যাঁর মুখ সব চেয়ে অন্ধকার হবার কথা, তাঁর মুখেই কোন বিকার নেই। স্বামীর নিত্য-প্রসন্ন মুখ, আজও তেমনি প্রসন্ন!

হায় রে, শুধু একবার গিয়ে যদি বলি, প্রভু, এই পাপিষ্ঠার মুখ থেকে তার অপরাধের বিবরণ শুনে তাকে নিজের হাতে দণ্ড দাও, কিন্তু, সমস্ত লোকের এই বিচারহীন শাস্তি আর সহ্য হয় না! কিন্তু, সে ত কোন মতেই পারলুম না। তবুও এই বাড়ীতে এই ঘরের মধ্যেই আমার দিন কাটতে লাগল।

এ কেমন কোরে আমার দ্বারা সম্ভব হ'তে পেরেছিল, তা আজ আমি জানি! যে কাল মায়ের বুক থেকে পুত্রশোকের ভার পর্য্যন্ত হাল্কা ক'রে দেয়, সে যে এই পাপিষ্ঠার মাথা থেকে তার অপরাধের বোঝা লঘু ক'রে দেবে, সে আর বিচিত্র কি? যে দণ্ড একদিন মানুষ অকাতরে মাথায় তুলে নেয়, আর একদিন তাকেই সে মাথা থেকে ফেলতে পারলে বাঁচে! কালের ব্যবধানে অপরাধের খোঁচা যত অস্পষ্ট, যত লঘু হয়ে

আসৃতে থাকে, দণ্ডের ভার ততই গুরুতর, ততই অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে! এই ত মানুষের মন! এই ত' তার গঠন! তাকেও নিশ্চিত সংশয়ে মরিয়া কোরে তোলে। একদিন, দু'দিন ক'রে যখন সাতদিন কেটে গেল, তখন কেবলই মনে হ'তে লাগল, এতই কি দোষ ক'রেচি যে, স্বামী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা না কোরে নির্ব্বিচারে দণ্ড দিয়ে যাবেন! কিন্তু তিনি যে সকলের সঙ্গে মিলে নিঃশব্দে আমাকে পীড়ন করে যাচ্ছেন, এ বুদ্ধি যে কোথায় পেয়েছিলুম, এখন তাই শুধু ভাবি।

সেদিন সকালে শুনলুম, শাশুড়ী বলচেন, "ফিরে এলি মা মুক্ত! পাঁচদিন ব'লে কত দিন দেরি কর্‌লি বল্‌ত বাছা?"

সে যে কেন ফিরে এসেচে, তা মনে মনে বুঝলুম।

নাইতে যাচ্ছি, দেখা হ'ল। মুচকে হেসে হাতের মধ্যে একটা কাগজ গুঁজে দিলে। হঠাৎ মনে হ'ল, সে যেন এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা আমার হাতের তেলোয় টিপে ধরেচে। ইচ্ছে হ'ল, তখ্‌খুনি কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু সে যে নরেনের চিঠি! না প'ড়েই যদি ছিঁড়ে ফেল্‌তে পার্‌ব, তা হ'লে মেয়েমানুষের মনের মধ্যে বিশ্বের সেই অফুরন্ত চিরন্তন কৌতূহল জমা হয়ে' রয়েচে কিসের জন্যে? নির্জ্জন পুকুরঘাটে জলে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিঠি খুলে বস্‌লুম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও পড়্‌তে পার্‌লুম না। চিঠি লাল কালীতে লেখা। মনে হ'তে লাগল, তার রাঙা অক্ষরগুলো যেন একপাল কেন্নোর বাচ্চার মত গায়ে গায়ে জড়িয়ে কিল-বিল ক'রে ন'ড়ে ন'ড়ে বেড়াচ্ছে! তার পরে পড়্‌লুম—একবার—দু'বার—তিনবার পড়্‌লুম। তার পরে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে স্নান ক'রে ঘরে ফিরে এলুম। কি ছিল তাতে? সংসারে যা সব চেয়ে বড় অপরাধ, তাই লেখা ছিল।

ধোপা এসে বল্‌লে, "মা ঠাকরুণ, বাবুর ময়লা কাপড় দাও।"

জামার পকেটগুলা সব দেখে দিতে গিয়ে একখানা পোষ্টকার্ড বেরিয়ে এল, হাতে তুলে দেখি, আমার চিঠি, মা লিখেচেন। তারিখ দেখ্‌লুম, পাঁচ দিন আগের, কিন্তু আজও আমি পাইনি।

প'ড়ে দেখি সর্ব্বনাশ! মা লিখেচেন, শুধু রান্না-ঘরটি ছাড়া আর সমস্ত পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। এই ঘরটির মধ্যে কোনমতে সবাই মাথা গুঁজে আছেন!

দু'চোখ জ্বাল্যা করতে লাগল, কিন্তু এককোঁটা জল বেরুল না। কত-ক্ষণ যে এ ভাবে ব'সেছিলুম, জানিনে, ধোপার চীৎকারে আবার সজাগ হয়ে উঠ্‌লুম। তাড়াতাড়ি তাকে কাপড়গুলো ফেলে দিয়ে, বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌লুম। এইবার চোখের জলে বালিস ভিজে গেল। কিন্তু, এই কি তাঁর ঈশ্বরপরায়ণতা! আমার মা গরীব, একবিন্দু সাহায্য করতে অনুরোধ করি, এই ভয়ে চিঠিখানা পর্য্যন্ত আমাকে দেওয়া হয়নি। এত বড় ক্ষুদ্রতা আমার নাস্তিক মামার দ্বারা কি কখনো সম্ভব হ'তে পারত!

আজ তিনি ঘরে আস্‌তে কথা কইলুম। বল্‌লুম, "আমাদের বাড়ী পুড়ে গেছে।"

তিনি মুখপানে চেয়ে বল্‌লেন, "কোথায় শুন্‌লে?"

গায়ের ওপর পোষ্টকার্ডখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জবাব দিলুম, "ধোপাকে কাপড় দিতে তোমারই পকেট থেকে পেলুম। দেখ, আমাকে নাস্তিক ব'লে তুমি ঘৃণা কর জানি, কিন্তু, যারা লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ে, আড়ালে গোয়েন্দাগিরি ক'রে বেড়ায়, তাদের আমরাও ঘৃণা করি। তোমার বাড়ীশুদ্ধ লোকেরই কি এই ব্যবসা?"

যে লোক নিজের অপরাধে মগ্ন হয়ে আছে, তার মুখের এই কথা! কিন্তু, আমি নিঃসংশয়ে বল্‌তে পারি, এত বড় স্পর্দ্ধিত আঘাত আমার

স্বামী ছাড়া আর কেউ সহ্য কর্‌তে পার্‌ত না। মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয়-কবচের মতই যে তাঁর মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষে কর্‌ত, আমার এমন তীক্ষ্ণ শূলও থান্ থান্ হয়ে পড়ে গেল।

একটুখানি ম্লান হেসে বল্‌লেন, "কেমন অন্যমনস্ক হয়ে প'ড়ে ফেলেছিলুম, সদু, আমাকে মাপ কর।"

এই প্রথম তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন।

বল্‌লুম, "মিথ্যে কথা। তা হ'লে আমার চিঠি আমাকে দিতে। কেন এ খবর লুকিয়েছ, তাও জানি।"

তিনি বল্‌লেন, "শুধু দুঃখ পেতে বই ত না। তাই ভেবেছিলুম, কিছু দিন পরে তোমাকে জানাবো।"

বল্‌লুম, "কেমন করে তুমি হাত গোণো, সে আমার জান্‌তে বাকি নেই। তুমিই কি বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে আমার পিছুনে গোয়েন্দা লাগিয়েছ? স্পাই! ইংরেজ-মহিলারা এমন স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখে না, তা জানি?"

ওরে হতভাগী! বল্, বল্, যা মুখে আসে ব'লে নে। শাস্তি তোর গেছে কোথায়, সবই যে তোলা রইল!

স্বামী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন,—একটা কথারও জবাব দিলেন না। এখন ভাবি, এত ক্ষমা কর্‌তেও মানুষে পারে!

কিন্তু আমার ভেতরে যত গ্লানি, যত অপমান, এতদিন ধীরে ধীরে জমা হয়ে উঠেছিল, একবার মুক্তি পেয়ে তারা কোন মতেই আর ফির্‌তে চাইলে না।

একটু থেমে আবার বল্‌লুম, "আমি হেঁসেলে ঢুকতে—"

তিনি একটুখানি যেন চম্‌কে উঠে মাঝখানেই বলে উঠ্‌লেন, "উঃ, তাই বটে! তাই আমার খাবার ব্যবস্থাটা আবার—"

বল্‌লুম, "সে নালিশ আমার নয়। বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেচি বলেই যে তোমরা খুঁচে খুঁচে আমাকে তিল তিল করে মার্‌বে, সে অধিকার

তোমাদের আমি কিছুতে নেব না, তা নিশ্চয় জেনো। আমার মামার বাড়ীতে এখনো ত রান্না-ঘরটা বাকী আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাব। কা'ল আমি যাচ্ছি।"

স্বামী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বল্‌লেন, "যাওয়াই উচিত বটে! কিন্তু, তোমার গয়নাগুলো রেখে যেয়ো।"

শুনে অবাক্ হ'য়ে গেলুম। এত হীন, এত ছোট স্বামীর স্ত্রী আমি। পোড়া মুখে হঠাৎ হাসি এলো। বল্‌লুম, "সেগুলো কেড়ে নিতে চাও ত, বেশ, আমি রেখেই যাব।"

প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম, তাঁর মুখখানি যেন শাদা হয়ে গেল! বল্‌লেন, "না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি, আমার টাকার বড় অনাটন, তাই বাঁধা দেবো।"

কিন্তু এম্‌নি পোড়াকপালী আমি যে, ও-মুখ দেখেও কথাটা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লুম না। বল্‌লুম, "বাঁধা দাও, বেচে ফ্যালো, যা ইচ্ছে কোরো, তোমাদের গয়নার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই।" ব'লে, তখুনি বাক্স খুলে আমার সমস্ত গয়না বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। যে দু'গাছি বালা মা দিয়েছিলেন, সেই দু'টি ছাড়া গা থেকে পর্য্যন্ত সমস্ত গয়না খুলে ফেলে দিলুম। তাতেও তৃপ্তি হ'লো না, বেনারসী কাপড় জামা প্রভৃতি যা কিছু এঁরা দিয়েছিলেন, সমস্ত বার ক'রে টান্ মেরে ফেলে দিলুম।

স্বামী পাথরের মত স্থির-নির্ব্বাক্ হ'য়ে ব'সে রইলেন। আমার ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা এম্‌নি বিষিয়ে উঠ্‌ল যে, এক ঘরের মধ্যে থাকাও অসহ্য হ'য়ে প'ড়্‌ল। বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দায় একধারে আঁচল পেতে শুয়ে প'ড়্‌লুম। মনে হ'ল, দোরের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে গেল।

কান্নায় বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল, তবু প্রাণপণে, মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মান বাঁচালুম।

কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনে, উঠে দেখি, ভোর হয় হয়। ঘরে গিয়ে দেখি, বিছানা খালি, দু'একখানি ছাড়া প্রায় সমস্ত গয়নাই নিয়ে তিনি কখন বেরিয়ে গেছেন।

সারাদিন তিনি বাড়ী এলেন না। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নাই।

তন্দ্রার মধ্যেও বোধ করি সজাগ ছিলুম। রাত্রি দু'টোর পর বাগানের দিকের সেই জানালাটার গায়ে খট্-খট্ শব্দ শুনেই বুঝলুম, এ নরেন। কেমন করে যেন আমি নিশ্চয় জান্‌তুম, আজ রাত্রে সে আসবে। স্বামী ঘরে নেই, এ খবর মুক্ত দেবেই এবং এ সুযোগ সে কিছুতে ছাড়্‌বে না। কোথাও কাছা-কাছি সে যে আছেই, এ যেন আমি ভাবী অমঙ্গলের মত অনুভব কর্‌তুম। নরেন এত নিঃসংশয় ছিল যে, সে অনায়াসে বল্‌লে—"দেরি কোরো না, যেমন আছ বেরিয়ে এসো, মুক্ত খিড়কি খুলে দাঁড়িয়ে আছে।"

বাগান পার হ'য়ে রাস্তা দিয়ে অনেকখানি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বস্‌লুম। মা বসুমতি! গাড়ী শুদ্ধ হতভাগীকে সেদিন গ্রাস কর্‌লে না কেন?

কল্‌কাতায় বউ-বাজারের একটা ছোট্ট বাসায় গিয়ে যখন উঠ্‌লুম, তখন বেলা সাড়ে-আট্‌টা। আমাকে পৌঁছে দিয়েই নরেন তার নিজের বাসায় কিছুক্ষণের জন্যে চ'লে গেল। দাসী উপরের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছিল, টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে শুয়ে পড়্‌লুম। আশ্চর্য্য, যে, যে কথা কখনও ভাবিনি, সমস্ত ভাবনা ছেয়ে, সেই কথাই আমার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমি ন'বছর বয়সে একবার জলে ডুবে যাই, অনেক যত্ন-চেষ্টার পরে জ্ঞান হ'লে মায়ের হাত ধ'রে ঘরের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি! মা শিয়রে ব'সে এক হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, এক হাতে পাখার বাতাস করেছিলেন,—মায়ের মুখ, আর তাঁর সেই পাখা নিয়ে হাত নাড়াটা ছাড়া সংসারে আর যেন আমার কিছু রইল না।

দাসী এসে বল্‌লে, "বউ-মা, কলের জল চ'লে যাবে, উঠে চান ক'রে নাও।"

স্নান ক'রে এলুম, উড়ে-বামুণ ভাত দিয়ে গেল। মনে হয় কিছু খেয়েও ছিলুম, কিন্তু উঠ্‌তে উঠ্‌তে সমস্ত বমি হ'য়ে গেল। তার পরে হাত-মুখ ধুয়ে নির্জ্জীবের মত বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌বামাত্রই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

স্বপ্ন দেখ্‌লুম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌চি। তিনি তেমনি নীরবে ব'সে আছেন, আর আমি গায়ের গয়না খুলে তাঁর গায়ে ছুঁড়ে ফেল্‌চি; কিন্তু গয়নাগুলোও আর ফুরোয় না, আমার ছুঁড়ে ফেলাও থামে না। যত ফেলি, ততই যেন কোথা থেকে গয়নায় সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে ওঠে!

হঠাৎ হাতের ভারি অনন্তটা ছুঁড়ে ফেল্‌তেই সেটা সজোরে গিয়ে তাঁর কপালে লাগ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজে শুয়ে পড়্‌লেন, আর সেই ফাটা কপাল থেকে রক্তের ধারা ফিন্‌কি দিয়ে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেক্‌তে লাগল!

এমন করে কতক্ষণ যে কেটেছিল, আর কতক্ষণ যে কাট্‌তে পার্‌ত বল্‌তে পারিনে। যখন ঘুম ভাঙল, তখনি চোখের জলে বালিস বিছানা ভিজে গেছে।

চোখ চেয়ে দেখি, তখন অনেক বেলা আছে, আর নরেন পাশে ব'সে আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙাচ্চে।

সে বল্‌লে, "স্বপন দেখ্‌ছিলে! ইস্, এ হয়েছে কি।" ব'লে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে।

স্বপন? এক মুহূর্ত্তে মনটা যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

চোখ রগ্‌ড়ে উঠে ব'সে দেখলুম, সুমুখেই মস্ত একটা কাগজে-মোড়া পার্শ্বেল।

"ও কি?"

"তোমার জামা-কাপড় সব কিনে আন্লুম।"

"তুমি কিন্তে গেলে কেন ?"

নরেন একটু হেসে বল্লে, "আমি ছাড়া আর কে কিন্বে ?"

* * * *

* * * *

এত কান্না আমি আর কখনও কাঁদিনি। নরেন বল্লে, "আচ্ছা, পা ছেড়ে উঠে বোস্ বোন্, আমি দিব্যি কর্চি, আমরা এক মায়ের পেটের ভাই-বোন্। তোকে আমি যত ভালই বাসিনে কেন, তবু আমি আমার কাছ থেকে তোকে চিরকাল রক্ষে কর্ব।"

"চিরকাল! না না, তাঁর পায়ের ওপর আমাকে তোমরা ফেলে দিয়ে চ'লে এসো, নরেন দাদা, আমার অদৃষ্টে যা হবার তা' হোক্। কাল সমস্ত রাত্রি তাঁকে চোখে দেখিনি, আজ আবার সমস্ত রাত্রি দেখ্তে না পেলে যে আমি ম'রে যাব ভাই!"

দাসী ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল। নরেন উঠে গিয়ে একটা মোড়ার ওপর ব'সে বল্লে, "মুক্তর কাছে আমি সমস্ত শুনেচি! কিন্তু তাঁকে যদি এতই ভালবাসতে, কোন দিন এক সঙ্গে ত'—"

তাড়াতাড়ি বল্লুম, "তুমি আমার বড় ভাই, এ-সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞেসা কোরো না।"

নরেন অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বল্লে, "আমি আজই তোমাকে তোমাদের বাগানের কাছে রেখে আস্তে পারি, কিন্তু, তিনি কি তোমাকে নেবেন ? তখন গ্রামের মধ্যে তোমার দুর্গতি কি হবে, বল ত ?" বুকের ভেতরটা কে যেন দু'হাতে পাকিয়ে মুচ্ড়ে দিলে। কিন্তু তখ্খুনি নিজেকে সাম্লে নিয়ে বল্লুম, "ঘরে নেবেন না, সে জানি, কিন্তু, তিনি যে আমাকে মাপ ক'র্বেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপরাধ হোক্ সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বল্বার যো

নেই, এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেচি, ভাই! আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এসো নরেন দা', ভগবান্ তোমাকে রাজ্যেশ্বর করবেন, আমি কায়মনে বল্‌চি।"

মনে করেছিলুম, আর চোখের জল ফেল্‌বো না, কিন্তু, কিছুতেই ধ'রে রাখ্‌তে পারলুম না, আবার ঝর্ ঝর্ ক'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। নরেন মিনিট খানেক চুপ ক'রে বল্‌লে, "সদু, তুমি কি সত্যিই ভগবান্ মানো?"

আজ চরম-দুঃখে মুখ দিয়ে পরম-সত্য বার হয়ে গেল; বল্‌লুম, "মানি। তিনি আছেন বলেই ত এত ক'রেও ফিরে যেতে চাইচি। নইলে, এইখানে গলায় দড়ী দিয়ে মরতুম, নরেন দাদা, ফিরে যাবার কথা মুখে আন্‌তুম না।"

নরেন বল্‌লে, "কিন্তু আমি ত মানিনে।"

তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লুম, "আমি বল্‌চি, আমার মত তুমিও একদিন নিশ্চয় মান্‌বে।"

"সে তখন বোঝা যাবে" বলে নরেন গম্ভীরমুখে ব'সে রইল। মনে মনে কি যেন ভাব্‌চে বুঝ্‌তে পেরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লুম। আমার এক মিনিট দেরি সইছিল না, "বল্‌লুম, "আমাকে কখন রেখে আস্‌বে, নরেন দা?"

নরেন মুখ তুলে ধীরে ধীরে বল্‌লে, "সে কখ্‌খনো তোমাকে নেবে না।"

"সে চিন্তা কেন করচ ভাই? নিন্ না নিন্, সে তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু, আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন, এ কথা নিশ্চয় বল্‌তে পারি।"

"ক্ষমা! না নিলে ক্ষমা করা, না-করা, দুই-ই সমান। তখন তুমি কোথায় যাবে বল ত? সমস্ত পাড়ার মধ্যে কত বড় একটা বিশ্রী হৈ-চৈ গণ্ডগোল প'ড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি!"

ভয়ে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্‌লুম, "সে ভাবনা তুমি এতটুকু কোরো না, নরেন দাদা! তখন তিনিই আমার উপায় কোরে দেবেন!"

নরেন আবার কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্‌লে, "আর তোমারই না হয় একটা উপায় কর্‌বেন, কিন্তু আমার ত কর্‌বেন না! তখন?"

এ কথার কি জবাব দেব, ভেবে পেলুম না। বল্‌লুম, "তাতেই বা তোমার ভয় কি?"

নরেন ম্লানমুখে জোর ক'রে একটু হেসে বল্‌লে, "ভয়? এমন কিছু নয়, পাঁচ সাত বছরের জন্যে জেল খাট্‌তে হবে। শেষকালে এমন কোরে তুমি আমাকে ডোবাবে জান্‌লে, আমি এতে হাতই দিতুম না। মনের এতটুকু স্থির নেই, এ কি ছেলেখেলা?"

আমি কেঁদে ফেলে বল্‌লুম, "তবে আমার কি উপায় হবে ভাই? আমার সমস্ত অপরাধ তাঁর পায়ে নিবেদন না ক'রে ত আমি কিছুতে বাঁচ্‌ব না!"

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "শুধু নিজের কথাই ভাব্‌চ, আমার বিপদ ত ভাব্‌চ না? এখন সব দিক্ না বুঝে আমি কোন কাজ কর্‌তে পার্‌ব না।"

"ও কি, তুমি বাসায় যাচ্চ না কি?"

"হুঁ।"

রাগে, দুঃখে, হতাশ্বাসে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাথা কুটে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম, "তুমি সঙ্গে না যাও, এইখান থেকে আমার যাবার উপায় করে দাও, আমি একলা ফিরে যাবো। ওগো, আমি তাঁর দিব্যি কোরে বল্‌চি আমি কারুর নাম কর্‌ব না—কাউকে বিপদে জড়াবো না, সমস্ত শাস্তি একা মাথা পেতে নেব।—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি 'নরেন দা' আমাকে আট্‌কে রেখে আমার আর সর্ব্বনাশ কোরো না।"

মুখ তুলে দেখি, ঘরে সে নেই—পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে সদর দরজায় দেখি, তালা বন্ধ। উড়ে-বামুণ বল্‌লে, "বাবু চাবি নিয়ে চলে গেছেন, কাল সকালে এসে খুলে দেবেন।"

ঘরে ফিরে এসে আর একবার মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লুম, "ভগবান্! কখনো তোমাকে ডাকিনি আজ ডাক্‌চি, তোমার এই একান্ত নিরুপায় মহাপাপিষ্ঠা সন্তানের গতি করে দাও।"

আমার সে ডাক যে কত প্রচণ্ড, তার শক্তি যে কি দুর্নিবার, আজ সে শুধু আমিই জানি।

তবু সাত দিন কেটে গেল। কিন্তু, কেমন, ক'রে যে কাট্‌ল, সে ইতিহাস বল্‌বার আমার সামর্থ্যও নেই, ধৈর্য্যও নেই। সে যাক্।

বিকেলবেলায় আমার ওপরের ঘরের জানালায় বসে নীচে গলির পানে তাকিয়েছিলুম। আফিসের ছুটি হয়ে গেছে—সারাদিনের খাটুনির পর বাবুরা বাড়ীমুখো—হন্ হন্ ক'রে চ'লেচে। অধিকাংশই সামান্য গৃহস্থ। তাদের বাড়ীর ছবি আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠ্‌ল। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে এখন সব চেয়ে কারা বেশি ব্যস্ত, জলখাবার সাজাতে, চা তৈরি ক'র্‌তে সব চেয়ে কারা বেশি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে, সেটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ধক্ কোরে উঠ্‌ল। মনে প'ড়্‌ল, তিনিও সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে এলেন। কোথায় কাপড়, কোথায় গামছা, কোথায় জল! ডাকাডাকির পর কেউ হয় ত সাড়াও দিলে না। তার পরে হয় ত, মেজ-দেওরের খাবারের সঙ্গে তাঁরও একটুখানি জলখাবারের যোগাড় মেজ-বৌ করে রেখেচে, না হয় ভুলেই গেছে! আমি ত আর নেই,—ভুল্‌তে ভয়ই বা কি! হয় ত বা শুধু এক গেলাস জল চেয়ে খেয়ে ময়লা বিছানাটা কোঁচা দিয়ে একটু ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়্‌বেন। তার পরে রাত দুপুরে দু'টো শুক্‌নো—ঝরঝরে ভাত, একটু ভাতে-পোড়া। ও-বেলার একটুখানি ডাল হয় ত বা আছে, হয় ত বা উঠে গেছে! সকলের দিয়ে-থুয়ে দুধ একটু বাঁচে ত সে পরম ভাগ্য! নিরীহ ভাল মানুষ, কাউকে কড়া-কথা বল্‌তে পারেন না, কারো ওপর রাগ দেখাতে জানেন না—

ওরে মহাপাতকি! এত বড় নিষ্ঠুর-মহাপাপ তোর চেয়ে বেশি সংসারে কেউ কি কোন দিন ক'রেছে? ইচ্ছে হ'ল এই লোহার গরাদেতে মাথাটা ছেঁচে ফেলে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার এইখানেই শেষ ক'রে দিই!

বোধ করি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দিকেই চোখ ছিল না, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দে চম্‌কে উঠে দেখি, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নরেন আর মুক্ত। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে নীচের বিছানায় উঠে এসে বস্‌লুম। সেই দিন থেকে নরেন আর আসেনি। আমার সমস্ত মন যে কোথায় প'ড়ে আছে, সে নিঃসংশয়ে বুঝ্‌তে পেরেছিল ব'লে ভয়ে এ দিক্ মাড়াত না। তার নিশ্চয় ধারণা জন্মেছিল, বিপদে প'ড়্‌লে স্বামীর বিরুদ্ধে আমি তার কোন উপকারেই লাগ্‌ব না। তাই তার ভয়ও যেমন হয়েছিল, রাগও তেম্‌নি হয়েছিল। ঘরে ঢুকে আমার দিকে চেয়েই দু'জনে একসঙ্গে চম্‌কে উঠ্‌ল, নরেন বল্‌লে,—

"তোমার এত অসুখ করেছিল ত আমাকে খবর দাওনি কেন? তোমার বামুণটা ত আমার বাসা চেনে?"

ঝি দালানে ঝাঁট দিচ্ছিল, সে খপ্ কোরে ব'লে বস্‌ল, "অসুখ কর্‌বে কেন? শুধু জল খেয়ে থাক্‌লে মানুষ রোগা হবে না বাবু? দু'টি বেলা দেখ্‌ছি ভাতের থালা যেমন বাড়া হয়, তেম্‌নি পড়ে থাকে। অর্দ্ধেক দিন ত হাতও দেন না।" শুনে দু'জনেই স্তব্ধ হ'য়ে আমার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার পর নরেন বাসায় চ'লে গেলে, মুক্তকে বুকে টেনে নিয়ে বল্লুম, "কেমন আছেন তিনি?"

মুক্ত কেঁদে ফেল্‌লে। বল্‌লে,—"অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই বউ-মা, নইলে এমন সোণার সোয়ামীর ঘর কর্‌তে পেলে না?"

"তুই ত ঘর কর্‌তে দিলিনে মুক্ত!"

মুক্ত চোক মুছে বল্‌লে,—"মনে হ'লে বুকের ভেতরটায় যে,াক কর্‌তে

থাকে, সে আর তোমাকে কি বোল্‌ব ? বাবু ছাড়া আজও সবাই জানে, তুমি বাড়ী পোড়ার খবর পেয়ে রাত্তিরেই রাগারাগি ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেছ। তোমার শাশুড়ী ত তাঁর হুকুম নেওয়া হয় নি ব'লে রাগ কোরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তাই বন্ধ করে দিয়েচে। মাগী কি বজ্জাত মা, কি বজ্জাত ! যে কষ্টটা বাবুকে দিচ্চে, দেখ্‌লে পাষাণের দুঃখ হয় ! সাধে কি আর তুমি ঝগড়া করতে বউ-মা !"

"ঝগড়া করা আমার চিরকালের জন্মে ঘুচে গেল !" বল্‌তে গিয়ে সত্যি সত্যি যেন দম্ আট্‌কে এলো।

আজ মুক্তর কাছে শুনতে পেলুম, আমাদের পোড়া বাড়ী আবার মেরামত হচ্চে, তিনি টাকা দিয়েছেন। হয় ত সেই জন্যই আমার গহনাগুলো হঠাৎ বাঁধা দেবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল !

বল্‌লুম, "বল্ মুক্ত, সব বল্। যত রকমের বুক ফাটা খবর আছে, সমস্ত আমাকে একটি একটি কোরে শোনা—এতটুকু দয়া তোরা আমাকে করিস্‌নে।"

মুক্ত বল্‌লে,—"এ বাড়ীর ঠিকানা তিনি জানেন—"

শিউরে উঠে বল্‌লুম,—"কি কোরে ?"

"মাসখানেক আগে যখন এ বাড়ী তোমার জন্মেই ভাড়া নেওয়া হয়, তখন আমি জান্‌তুম।"

"তার পর ?"

"একদিন নদীর ধারে নরেনবাবুর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে কথা কইতে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন।"

"তার পর ?"

"বামুণের পা ছুঁয়ে মিথ্যে বল্‌তে পারলুম না বউ-মা, চ'লে আস্‌বার দিন এ বাসার ঠিকানা বলে ফেল্‌লুম।"

এলিয়ে মুক্তর কোলের ওপরই চোখ বুজে শুয়ে পড়্‌লুম !

অনেকক্ষণ পরে মুক্ত বল্‌লে,—"বউ-মা!"

"কেন মুক্ত?"

"যদি তিনি নিজে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসে পড়েন?"

প্রাণপণ-বলে উঠে বোসে মুক্তর মুখ চেপে ধর্‌লুম—"না মুক্ত, ও-কথা তোকে আমি বল্‌তে দেব না। আমার দুঃখ আমাকে সজ্ঞানে বইতে দে, পাগল কোরে দিয়ে আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ তুই বন্ধ ক'রে দিস্‌নে—"

মুক্ত জোর ক'রে তার মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে, "আমাকেও ত প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে বউ-মা? টাকার সঙ্গে ত এঁকে ওজন্ কোরে ঘরে তুল্‌তে পার্‌ব না!"

এ কথার আর জবাব দিলুম না, চোখ বুজে শুয়ে পড়্‌লুম। মনে মনে বল্‌লুম,—"ওরে মুক্ত, পৃথিবী এখনও পৃথিবী আছে। আকাশ-কুসুমের কথা কাণেই শোনা যায়, তাকে ফুটতে কেউ আজও চোখে দেখেনি।"

ঘণ্টাখানেক পরে মুক্ত নীচে থেকে ভাত খেয়ে ফিরে এলো, তখন রাত্রি দশটা! ঘরে ঢুকেই বল্‌লে,—"মাথায় আঁচলটা তুলে দাও বউ-মা, বাবু আস্‌চেন", বলেই বেরিয়ে গেল।

আবার এত রাত্রে? তাড়াতাড়ি কাপড় সেরে উঠে বস্‌তেই দেখ্‌লুম, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন নয়,—আমার স্বামী।

বল্‌লেন,—"তোমাকে কিছুই বল্‌তে হবে না। আমি জানি, তুমি আমারই আছ। বাড়ী চল।"

মনে মনে বল্‌লুম, "ভগবান্। এত যদি দিলে, তবে আরও একটু দাও—ওই দু'টি পায়ে মাথা রাখবার সময়টুকু পর্য্যন্ত আমাকে সচেতন রাখো।"

একাদশী বৈরাগী

কালীদহ গ্রামটা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ইহার গোপাল মুখুয্যের ছেলে অপূর্ব্ব ছেলেবেলা হইতেই ছেলেদের মোড়ল ছিল। এবার সে যখন বছর পাঁচ-ছয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া অনার-সমেত বি-এ পাশ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের মধ্যে তাহার প্রসার-প্রতিপত্তির আর অবধি রহিল না! গ্রামের মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ একটা হাই ইস্কুল ছিল,—তাহার সমবয়সীরা ইতিমধ্যে ইহাতেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া, সন্ধ্যাহ্নিক ছাড়িয়া দিয়া দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু কলিকাতা-প্রত্যাগত এই গ্রাজুয়েট ছোক্‌রার মাথার চুল সমান করিয়া তাহারই মাঝখানে একখণ্ড নধর টিকির সংস্থান দেখিয়া, শুধু ছোকরা কেন, তাহাদের বাবা-দের পর্য্যন্ত বিস্ময়ে তাক্ লাগিয়া গেল। সহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, অপূর্ব্ব সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে গিয়াছিল। এখন সঙ্গীদের মধ্যে ইহাই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিল যে, এই হিন্দুধর্ম্মের মত এমন সনাতন ধর্ম্ম আর নাই; কারণ ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই বিজ্ঞান-সম্মত। টিকির বৈদ্যুতিক উপযোগিতা, দেহরক্ষা-ব্যাপারে সন্ধ্যাহ্নিকের পরম উপকারিতা, কাঁচকলা ভক্ষণের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি বহুবিধ অপরিজ্ঞাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রামের ছেলে-বুড়ো-নির্ব্বিশেষে অভিভূত হইয়া গেল, এবং তাহার ফল হইল এই যে, অনতিকাল মধ্যেই ছেলেদের টিকি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, একাদশী, পূর্ণিমা, ও গঙ্গাস্নানের ঘটায় বাড়ীর মেয়েরাও হার মানিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার, দেশোদ্ধার ইত্যাদির জল্পনায়-কল্পনায় যুবকমহলে একেবারে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল।

বুড়ারা বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ, গোপাল মুখুয্যের বরাত বটে ! মা কমলারও যেমন সুদৃষ্টি, সন্তান জন্মিয়াছেও তেম্‌নি। না হইলে আজকালকার কালে এতগুলো ইংরাজী পাশ করিয়াও এই বয়সে এমনি ধর্ম্মে মতিগতি কয়টা দেখা যায় !" সুতরাং দেশের মধ্যে অপূর্ব্ব, একটা অপূর্ব্ব বস্তু হইয়া উঠিল। তাহার হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী ধূমপান-নিবারিণী ও দুর্নীতি-দলনী—এই তিন-তিনটা সভার আস্ফালনে গ্রামে চাষাভূষার দল পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাঁচকড়ি তেওর তাড়ি খাইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল শুনিতে পাইয়া, অপূর্ব্ব সদলবলে উপস্থিত হইয়া পাঁচকড়িকে এম্‌নি শাসিত করিয়া দিল যে, পরদিন পাঁচকড়ির স্ত্রী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ী পলাইয়া গেল। ভগা কাওরা অনেক রাত্রে বিল হইতে মাছ ধরিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে গাঁজার ঝোঁকে না কি বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর গান গাহিয়া যাইতেছিল ; ব্রাহ্মণপাড়ার অবিনাশের কাণে যাওয়ায়, সে তার নাক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া তবে ছাড়িয়া দিল ! দুর্গা ডোমের চৌদ্দ পনের বছরের ছেলে বিড়ি খাইয়া মাঠে যাইতেছিল ; অপূর্ব্বর দলের ছোক্‌রার চোখে পড়ায়, সে তাহার পিঠের উপর সেই জ্বলন্ত বিড়ি চাপিয়া ধরিয়া ফোস্কা তুলিয়া দিল। এম্‌নি করিয়া অপূর্ব্বর হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী ও দুর্নীতি-দলনী সভা ভানুমতীর আমগাছের মত সদ্যসদ্যই ফুলেফলে কালীদহ গ্রামটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এইবার গ্রামের মানসিক উন্নতির দিকে নজর দিতে গিয়া অপূর্ব্বর চোখে পড়িল যে, ইস্কুলের লাই-ব্রেরীতে শশিভূষণের দেড়খানা মানচিত্র ও বঙ্কিমের আড়াইখানা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই দীনতার জন্য সে হেডমাষ্টারকে অশেষ-রূপে লাঞ্ছিত করিয়া অবশেষে নিজেই লাইব্রেরী গঠন করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। তাহার সভাপতিত্বে চাঁদার খাতা, আইন-কানুনের তালিকা এবং পুস্তকের লিষ্ট তৈরী হইতে বিলম্ব হইল না। এতদিন ছেলেদের ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোনমতে সহিয়াছিল ;

কিন্তু দুই-এক দিনের মধ্যেই তাহাদের চাঁদা আদায়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র গৃহস্থের কাছে এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, খাতা-বগলে ছেলে দেখিলেই তাহারা বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশ দেখা গেল, গ্রামে ধর্ম্ম-প্রচার ও দুর্নীতি-দলনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়াছিল, লাইব্রেরীর জন্য অর্থ-সংগ্রহের পথ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়। অপূর্ব্ব কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা ভারি সুরাহা চোখে পড়িল। ইস্কুলের অদূরে একটা পরিত্যক্ত, পোড়ো ভিটার প্রতি একদিন অপূর্ব্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শোনা গেল, ইহা একদশী বৈরাগীর। অনুসন্ধান করিতে জানা গেল, লোকটা কি একটা গর্হিত সামাজিক অপরাধ করায় গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তাহার ধোপা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বছর-দশেক পূর্ব্বে উদ্বাস্ত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এখন সে ক্রোশ-দুই উত্তরে বারুইপুর গ্রামে বাস করিতেছে। লোকটা না কি টাকার কুমীর; কিন্তু, তাহার সাবেক নাম যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না,—হাঁড়ি-ফাটার ভয়ে বহুদিনের অব্যবহারে মানুষের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে। তদবধি এই একাদশী নামেই বৈরাগী মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ। অপূর্ব্ব তাল ঠুকিয়া কহিল, "টাকার কুমীর! সামাজিক কদাচার! তবে ত এই ব্যাটাই লাইব্রেরীর অর্দ্ধেক ভার বহন করিতে বাধ্য। না হইলে সেখানের ধোপা, নাপিত, মুদীও বন্ধ! বারুইপুরের জমীদার ত দিদির মামাশ্বশুর।"

ছেলেরা মাতিয়া উঠিল, এবং অবিলম্বে ডোনেশনের খাতায় বৈরাগী নামের পিছনে একটা মস্ত অঙ্কপাত হইয়া গেল। একাদশীর কাছে টাকা আদায় করা হইবে, না হইলে অপূর্ব্ব তাহার দিদির মামাশ্বশুরকে বলিয়া বারুইপুরেও ধোপা-নাপিত বন্ধ করিবে, সংবাদ পাইয়া রসিক-স্মৃতিরত্ন লাইব্রেরীর মঙ্গলার্থ উপযাচক হইয়া পরামর্শ দিয়া গেলেন যে, বেশ একটু মোটা টাকা না দিলে মহাপাপী ব্যাটা কালীদহে বাস্ত কি

করিয়া রক্ষা করে, দেখিতে হইবে। কারণ, বাস না করিলেও এই বাস্তুভিটার উপর একাদশীর যে অত্যন্ত মমতা, স্মৃতিরত্নের তাহা অগোচর ছিল না। যেহেতু, বছর-দুই পূর্ব্বে এই জমীটুকু খরিদ করিয়া নিজের বাগানের অঙ্গীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবে তখন একাদশী অত্যন্ত সাধু-ব্যক্তির ন্যায় কাণে আঙুল দিয়া বলিয়াছিল, "এমন অনুমতি করবেন না ঠাকুর-মশাই, ঐ এক ফোঁটা জমীর বদলে ব্রাহ্মণের কাছে দাম নিতে আমি কিছুতেই পারব না। ব্রাহ্মণের সেবায় লাগবে, এ তো আমার সাত-পুরুষের ভাগ্য।" স্মৃতিরত্ন নিরতিশয় পুলকিতচিত্তে তাহার দেব-দ্বিজে ভক্তি-শ্রদ্ধার লক্ষকোটি সুখ্যাতি করিয়া অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করার পরে, একাদশী করযোড়ে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল,—"কিন্তু এম্‌নি পোড়া অদৃষ্ট, ঠাকুর-মশাই, যে সাত-পুরুষের ভিটে আমার কিছুতেই হাতছাড়া করবার জো নেই। বাবা মরণকালে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, খেতেও যদি না পাস্ বাবা, বাস্তু-ভিটে কখনো ছাড়িস্ নে!" ইত্যাদি ইত্যাদি! সে আক্রোশ স্মৃতিরত্ন বিস্মৃত হন নাই।

দিন-পাঁচেক পরে, একদিন সকালবেলা এই ছেলের দলটি দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একাদশীর সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীটি মাটীর কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মীশ্রী আছে। অপূর্ব্ব কিংবা তাহার দলের আর কেহ একাদশীকে পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই; সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপে পা দিয়াই তাহাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। এ লোক টাকার কুমীরই হোক, হাঙ্গরই হোক, লাইব্রেরীর সম্বন্ধে যে পুঁটি মাছটির উপকারে আসিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। একাদশীর পেশা তেজারতি। বয়স ষাটের উপর গিয়াছে। সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ, তেমনি শুষ্ক। কণ্ঠভরা তুলসীর মালা। দাড়ি-গোঁফ কামানো

মুখখানার প্রতি চাহিলে মনে হয় না যে, কোথাও ইহার লেশমাত্র রসকস আছে। ইক্ষু যেমন নিজের রস কলের পেষণে বাহির করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজেই ইন্ধন হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া শুষ্ক করে, এ ব্যক্তি যেন তেমনি মানুষকে পুড়াইয়া শুষ্ক করিবার জন্যই নিজের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নিঙড়াইয়া বিসর্জ্জন দিয়া 'মহাজন' হইয়া বসিয়া আছে। তাহার শুধু চেহারা দেখিয়াই অপূর্ব্ব মনে মনে দমিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপের উপর ঢালা-বিছানা। মাঝখানে একাদশী বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে একটা কাঠের হাত-বাক্স, এবং একপাশে থাক-দেওয়া হিসেবের খাতাপত্র! একজন বৃদ্ধ-গোছের গোমস্তা খালি গায়ে পৈতার গোছা গলায় ঝুলাইয়া, শ্লেটের উপর সুদের হিসাব করিতেছে; এবং সম্মুখে, পার্শ্বে, বারান্দায় খুঁটির আড়ালে নানা বয়সের নানা অবস্থার স্ত্রী-পুরুষ, ম্লানমুখে বসিয়া আছে! কেহ ঋণ গ্রহণ করিতে, কেহ সুদ দিতে, কেহ বা শুধু সময় ভিক্ষা করিতেই আসিয়াছে;—কিন্তু ঋণ পরিশোধের জন্য কেহ যে বসিয়াছিল, তাহা কাহারও মুখ দেখিয়া মনে হইল না।

অকস্মাৎ কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রসন্তান দেখিয়া একাদশী বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিল। গোমস্তা শ্লেটখানা রাখিয়া দিয়া কহিল, "কোত্থেকে আস্‌ছেন?"

অপূর্ব্ব কহিল, "কালীদহ থেকে।"

"মশায় আপনারা?"

"আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।"

ব্রাহ্মণ শুনিয়া একাদশী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ঝুঁকাইয়া প্রণাম করিল; কহিল, "বোস্‌তে আজ্ঞা হোক্।"

সকলে উপবেশন করিলে একাদশী নিজেও বসিল। গোমস্তা প্রশ্ন করিল, "আপনাদের কি প্রয়োজন?"

অপূর্ব্ব লাইব্রেরীর উপকারিতা-সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া চাঁদার কথা পাড়িতে গিয়া দেখিল, একাদশীর ঘাড় আর একদিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সে খুঁটির আড়ালের স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, "তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর-মা ? সুদ ত হয়েছে কুল্লে সাত টাকা দু'আনা ; তার দু'আনা যদি ছাড়্ করে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের করে মেরে ফেল না কেন ?"

তার পরে উভয়ে এমনি ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করিয়া দিল,—যেন এই দু'আনা পয়সার উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু হারুর-মাও যেমন স্থিরসঙ্কল্প, একাদশীও তেমনি অটল। দেরী হইতেছে দেখিয়া, অপূর্ব্ব উভয়ের বাগ্‌বিতণ্ডার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, "আমাদের লাইব্রেরীর কথাটা—"

একাদশী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, এই যে শুনি ;—হাঁ রে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবুতে চাস্ রে। সে দু'টাকা এখনো শোধ দিলিনে, আবার একটাকা চাইতে এসেছিস্ কোন্ লজ্জায় শুনি ? বলি সুদটুদ কিছু এনেছিস্ ?"

নফর ট্যাঁক খুলিয়া এক আনা পয়সা বাহির করিতেই একাদশী চোখ রাঙাইয়া কহিল, "তিন মাস হয়ে গেল না রে ? আর দু'টো পয়সা কই ?"

নফর হাত জোড় করিয়া বলিল, "আর নেই কর্ত্তা ; ধাড়াপোর কত হাতে-পায়ে প'ড়ে পয়সা চারিটি ধার ক'রে আন্‌চি, বাকি দু'টো পয়সা আস্‌চে হাট-বারেই দিয়ে যাবো।"

একাদশী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, "দেখি তোর ওদিকের ট্যাঁকটা ?"

নফর বাঁ-দিকের ট্যাঁকটা দেখাইয়া অভিমানভরে কহিল, "দু'টো পয়সার জন্য মিছে কথা কইচি কর্ত্তা ? যে শালা পয়সা এনেও তোমারে ঠকায়, তার মুখে পোকা পড়ুক—এই বলে দিলুম।"

একাদশী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তুই চার্‌টে পয়সা ধার কোরে আন্‌তে পার্‌লি, আর দু'টো এম্‌নি ধার কর্‌তে পার্‌লিনে?"

নফর রাগিয়া কহিল, "মাইরি দিব্বাসা কর্‌লুম না কর্ত্তা! মুখে পোকা পড়ুক—"

অপূর্ব্বর গা জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা লোক ত তুমি মশাই!"

একাদশী একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র,—কোন কথা কহিল না। পরাণ বাগ্দী সুমুখের উঠান দিয়া যাইতেছিল; একাদশী হাত নাড়িয়া ডাকিয়া বলিল, "পরাণ, নফরার কাছাটা একবার খুলে দেখ্‌ত রে পয়সা দু'টো বাঁধা আছে না কি?"

পরাণ উঠিয়া আসিতেই নফর রাগ করিয়া তাহার কাছার খুঁটে বাঁধা পয়সা দু'টো খুলিয়া একাদশীর সামনে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। একাদশী এই বেয়াদপিতে কিছুমাত্র রাগ করিল না। গম্ভীর-মুখে পয়সা ছয়টা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া গোমস্তাকে কহিল, "ঘোষাল-মশাই নফরার নামে সুদ আদায় জমা ক'রে নেন। হাঁ রে, একটা টাকা কি আবার কোর্‌বি রে?"

নফর কহিল, "আবশ্যক না হ'লেই কি এয়েচি মশাই?"

একাদশী কহিল, "আট আনা নিয়ে যা না! গোটা টাকা নিয়ে গেলেই ত নয়-ছয় করে ফেল্‌বি রে!"

তার পর অনেক কষা মাজা করিয়া, নফর মোড়ল বারো আনা পয়সা কর্জ্জ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল। অপূর্ব্বর সঙ্গী অনাথ চাঁদার খাতাটা একাদশীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "যা দেবেন দিয়ে দিন মশাই, আমরা আর দেরী কর্‌তে পারিনে।"

একাদশী খাতাটা তুলিয়া লইয়া প্রায় পোনর মিনিট ধরিয়া

আগাগোড়া তন্নতন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া, শেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খাতাটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "আমি বুড়ো-মানুষ, আমার কাছে আবার চাঁদা কেন ?"

অপূর্ব্ব কোনমতে রাগ সামলাইয়া কহিল, "বুড়ো মানুষ টাকা দেবে না ত ছোট্ট ছেলেতে টাকা দেবে ? তারা পাবে কোথায় শুনি ?"

বুড়া সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, "ইস্কুল ত হয়েছে কুড়ি পঁচিশ বছর ; কৈ, এতদিন ত কেউ লাইব্রেরীর কথা তোলে নি বাপু ? তা যাক্, এ তো আর মন্দ কাজ নয়,—আমাদের ছেলেপুলে বই পড়ুক আর না পড়ুক, আমার গাঁয়ের ছেলেরাই পড়্বে ত ! কি বল ঘোষাল-মশাই ?" ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া কি যে বলিল বোঝা গেল না। একাদশী কহিল, "তা বেশ, চাঁদা দেব আমি,—একদিন এসে নিয়ে যাবেন চার আনা পয়সা। কি বল ঘোষাল, এর কমে আর ভাল দেখায় না ! অতদুর থেকে ছেলেরা এসে ধরেচে—যা'হোক একটু নাম-ডাক আছে বলেই ত ? আরও ত লোক আছে তাদের কাছে ত চাইতে যায় না,—কি বল হে ?"

ক্রোধে অপূর্ব্বর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অনাথ কহিল, "এই চার আনার জন্যে আমরা এত দূরে এসেচি ? তাও আবার আর একদিন এসে নিয়ে যেতে হবে ?" একাদশী মুখে একটা শব্দ করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "দেখ্লেন ত অবস্থা,—ছ'টা পয়সা হক্কের সুদ আদায় কর্তে ব্যাটাদের কাছে কি ছাঁচড়াপনাই না কর্তে হয় ? তা, এ পাট-টা বিক্রী না হয়ে গেলে আর চাঁদা দেবার সুবিধে—"

অপূর্ব্বর রাগে ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল ; বলিল, "সুবিধে হবে এখানেও ধোপা-নাপিত বন্ধ হলে। ব্যাটা পিশাচ সর্ব্বাঙ্গে ছিটে ফোঁটা কেটে জাত হারিয়ে বোষ্টম হয়েছেন,—আচ্ছা !"

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা আঙ্গুল তুলিয়া শাসাইয়া কহিল, "বারুইপুরের রাখালদাসবাবু আমাদের কুটুম—মনে থাকে যেন বৈরাগী !"

বুড়া বৈরাগী এই অভাবনীয় কাণ্ডে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। বিদেশী ছেলেদের অকস্মাৎ এত ক্রোধের হেতু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব্ব বলিল, "গরীবের রক্ত শুষে খাওয়া তোমার বা'র কোর্‌ব, তবে ছাড়্‌ব।"

নফর তখনও বসিয়াছিল; তাহার কাছায়-বাঁধা পয়সা-দু'টো আদায় করার রাগে মনে মনে ফুলিতেছিল; সে কহিল, "যা কইলেন কর্ত্তা, তা ঠিক। বৈরাগী নয়—পিচেশ! চোখে দেখ্‌লেন তো কি কোরে মোর পয়সা দু'টো আদায় নিলে!"

বুড়ার লাঞ্ছনায়, উপস্থিত সকলেই মনে-মনে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিপিন উৎসাহিত হইয়া চোখ টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরা ত ভেতরের কথা জানো না—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের লোক,—আমরা সব জানি। কি গো বুড়ো, আমাদের গাঁয়ে কেন তোমার ধোপা-নাপ্‌তে বন্ধ হয়েছিল বোল্‌ব?"

খবরটা পুরাতন। সবাই জানিত। একাদশী সদ্‌গোপের ছেলে—জাত-বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্রেয় ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে, অনেক অনুসন্ধানে, তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু, এই কদাচারে গ্রামের লোক বিস্মিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি একাদশী মা-বাপ-মরা এই বৈমাত্র ছোট-বোনটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল; তাহার ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিল; আবার অল্প বয়সে বিধবা হইয়া গেলে, দাদার ঘরেই সে আদর যত্নে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বয়স এবং বুদ্ধির দোষে সেই ভগিনীর এত বড় পদস্খলনে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল; আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ঘুরিয়া, অবশেষে যখন তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ঘরে

ফিরাইয়া আনিল, তখন গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসন মাথায় তুলিয়া লইয়া, তাহার এই লজ্জিতা, একান্ত অনুতপ্তা দুর্ভাগিনী ভগিনীটিকে আবার গৃহের বাহির করিয়া দিয়া, নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে একাদশী কোনমতেই রাজী হইতে পারিল না। অতঃপর গ্রামে তাহার ধোপা-নাপিত, মুদী প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল। কথাটা সবাই জানিত; তথাপি আর একজনের মুখ হইতে আর একজনের কলঙ্ক কাহিনীর মাধুর্য্যটা উপভোগ করিবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু, একাদশী লজ্জায়, ভয়ে, একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। তাহার নিজের জন্য নয়, ছোট-বোন্‌টির জন্য। প্রথম-যৌবনের অপরাধ গৌরীর বুকের মধ্যে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজিও যে তাহা তেমনি আছে, তিলার্দ্ধও শুষ্ক হয় নাই, বৃদ্ধ তাহা ভালরূপেই জানিত। পাছে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও তাহার কাণে গিয়া সেই ব্যথা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় একাদশী বিবর্ণমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার এই সকরুণ দৃষ্টির নীরব-মিনতি আর কাহারও চক্ষে পড়িল না, কিন্তু, অপূর্ব্ব হঠাৎ অনুভব করিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল।

বিপিন বলিতে লাগিল, "আমরা কি ভিখারী যে, দু'কোশ পথ হেঁটে এই রৌদ্রে চারগণ্ডা পয়সা ভিক্ষে চাইতে এসেচি! তাও আবার আজ নয়,—কবে ওঁর কোন্ খাতকের পাট বিক্রী হবে, সেই খবর নিয়ে আমাদের আর একদিন হাঁটতে হবে। তবে যদি বাবুর দয়া হয়! কিন্তু লোকের রক্ত শুষে সুদ খাও বুড়ো, মনে করেছ জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না? আমি এখানেও না তোমার হাড়ির হাল করি ত আমার নাম বিপিন ভট্‌চায্যিই নয়! ছোট-জাতের পয়সা হ'য়েচে ব'লে চোখে-কাণে আর দেখ্‌তে পাও না? চল হে অপূর্ব্ব, আমরা যাই—তার পরে যা জানি, করা যাবে।" বলিয়া সে অপূর্ব্বর হাত ধরিয়া টান্ দিল।

বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল ; বিশেষতঃ, এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া অপূর্ব্বর অত্যন্ত পিপাসা বোধ হওয়ায় কিছুক্ষণ পূর্ব্বে চাকরটাকে সে জল আনিতে বলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কলহ-বিবাদে সে কথা মনে ছিল না। কিন্তু তাহারই তৃষ্ণার জল একহাতে এবং অন্য হাতে রেকাবীতে গুটিকয়েক বাতাসা লইয়া, একটি সাতাশ-আটাশ বছরের বিধবা মেয়ে পাশের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে, তাহার জল চাওয়ার কথা স্মরণ হইল। গৌরীকে ছোট-জাতের মেয়ে বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। পরণে গরদের কাপড় ; স্নানের পর বোধ করি এইমাত্র আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল,—ব্রাহ্মণ জল চাহিয়াছে, চাকরের কাছে শুনিয়া, সে আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। কহিল, "আপনাদের কে জল চেয়েছিলেন যে।"

বিপিন কহিল, "পাটের শাড়ী পরে এলেই বুঝি তোমার হাতে জল খাবো আমরা ? অপূর্ব্ব, ইনিই সে বিশ্বেশ্বরী হে !"

চক্ষের নিমিষে মেয়েটির হাত হইতে বাতাসার রেকাবটা ঝনাৎ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল এবং সেই অসীম লজ্জা চোখে দেখিয়া অপূর্ব্ব নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সক্রোধে বিপিনকে একটা কনুয়ের গুঁতো মারিয়া কহিল, "এ-সব কি বাঁদরামি হচ্চে ? কাণ্ডজ্ঞান নেই ?"

বিপিন পাড়াগেঁয়ে মানুষ—কলহের মুখে অপমান করিতে নর-নারী ভেদাভেদ-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত নিরপেক্ষ বীরপুরুষ। সে অপূর্ব্বের খোঁচা খাইয়া আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া হাঁকিয়া কহিল, "কেন মিছে কথা বল্‌চি না কি ? ওর এত বড় সাহস যে, বামুণের ছেলের জন্যে জল আনে ? আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারি জানো ?"

অপূর্ব্ব বুঝিল, আর তর্ক নয়। অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। কহিল, "আমি আন্‌তে বলেছিলুম বিপিন, তুমি না জেনে অনর্থক ঝগড়া কোরো না ; চল, আমরা এখন যাই।"

গৌরী রেকাবীটি কুড়াইয়া লইয়া, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিঃশব্দে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। তথা হইতে কহিল, "দাদা, এঁরা যে কিসের চাঁদা নিতে এসেছিলেন, তুমি দিয়েচ ?"

একাদশী এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বলের স্থায় বসিয়াছিল, ভগিনীর আহ্বানে চকিত হইয়া বলিল, "না ; এই যে দিই দিদি।"

অপূর্ব্বর প্রতি চাহিয়া হাতযোড় করিয়া কহিল, "বাবু-মশাই, আমি গরীব-মানুষ ; চার আনাই আমার পক্ষে ঢের—দয়া ক'রে নিন।"

বিপিন পুনরায় কি একটা কড়া জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিল, অপূর্ব্ব ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল ; কিন্তু, এত কাণ্ডের পর সেই চার আনার প্রস্তাবে তাহার নিজেরও অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "থাক্ বৈরাগী, তোমার কিছু দিতে হবে না।"

একাদশী বুঝিল, ইহা রাগের কথা ; একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কলিকাল ! বাগে পেলে কেউ কি কারও ঘাড় ভাঙ্তে ছাড়ে ! দাও ঘোষাল-মশাই, পাঁচগণ্ডা পয়সাই খাতায় খরচ লেখো। কি আর কোর্ব বল !" বলিয়া বৈরাগী পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া অপূর্ব্বর এবার হাসি পাইল ! এই কুসীদজীবী বৃদ্ধের পক্ষে চার আনার এবং পাঁচ আনার মধ্যে কত বড় যে প্রকাণ্ড প্রভেদ, তাহা সে মনে মনে বুঝিল ; মৃদু হাসিয়া কহিল, "থাক্ বৈরাগী, তোমার দিতে হবে না ! আমরা চার-পাঁচ আনা পয়সা চাঁদা নিইনে ! আমরা চল্লুম।"

কি জানি, কেন অপূর্ব্ব একান্ত আশা করিয়াছিল, এই পাঁচ আনার বিরুদ্ধে দ্বারের অন্তরাল হইতে অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ আসিবে। তাহার অঞ্চলের প্রান্তটুকু তখনও দেখা যাইতেছিল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। যাইবার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব যথার্থ-ই ক্ষোভের সহিত মনে মনে কহিল, "ইহারা বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দান করা সম্বন্ধে পাঁচ

আনা পয়সার অধিক ইহাদের ধারণাই নাই। পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি-মাংস, পয়সার জন্য ইহারা করিতে পারে না, এমন কাজ সংসারে নাই।”

অপূর্ব্ব সদলবলে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, একটি বছর-দশেকের ছেলের প্রতি অনাথের দৃষ্টি পড়িল। ছেলেটির গলায় উত্তরীয়, বোধ করি, পিতৃ-বিয়োগ কিংবা এমনি কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার বিধবা জননী বারান্দায় খুঁটির আড়ালে বসিয়াছিল। অনাথ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “পুঁটে, তুই যে এখানে?”

পুঁটে আঙুল দেখাইয়া কহিল, “আমার মা ব'সে আছেন। মা বল্‌লেন, আমাদের অনেক টাকা ওঁর কাছে জমা আছে।” বলিয়া সে একাদশীকে দেখাইয়া দিল। কথাটা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও কৌতুহলী হইয়া উঠিল। ইহার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়, দেখিবার জন্য অপূর্ব্ব নিজের আকণ্ঠ পিপাসা-সত্ত্বেও বিপিনের হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

একাদশী প্রশ্ন করিল, “তোমার নামটি কি বাবা? বাড়ী কোথায়?”

ছেলেটি কহিল, “আমার নাম শশধর; বাড়ী ওঁদের গাঁয়ে—কালীদহে।”

“তোমার বাবার নামটি কি?”

ছেলেটির হইয়া এবার অনাথ জবাব দিল; কহিল, “এর বাপ অনেক দিন মারা গেছে। পিতামহ রামলোচন চাটুয্যে ছেলের মৃত্যুর পর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন; সাত বৎসর পরে মাসখানেক হ'ল ফিরে এসেছিলেন। পরশু এদের ঘরে আগুন লাগে, আগুন নিবাতে গিয়ে বৃদ্ধ মারা পড়েছেন। আর কেউ নেই, এই নাতিটিই শ্রাদ্ধাধিকারী।”

কাহিনী শুনিয়া সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিল, শুধু একাদশী চুপ করিয়া রহিল। একটু পরেই প্রশ্ন করিল, “টাকার হাতচিঠা আছে? যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো।”

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া কহিল, "কাগজপত্র কিছু নেই—সব পুড়ে গেছে।"

একাদশী প্রশ্ন করিল, "কত টাকা?"

এবার বিধবা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাথার কাপড়টা সরাইয়া জবাব দিল, "ঠাকুর মর্‌বার আগে ব'লে গেছেন, পাঁচশ' টাকা তিনি জমা রেখে তীর্থযাত্রা করেন। বাবা, আমরা বড় গরীব; সব টাকা না দাও, কিছু আমাদের ভিক্ষে দাও", বলিয়া বিধবা টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘোষাল-মশাই এতক্ষণ খাতা লেখা ছাড়িয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতে-ছিলেন; তিনিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "বলি কেউ সাক্ষী-টাক্ষী আছে?"

বিধবা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না। আমরাও জান্‌তুম না, ঠাকুর গোপনে টাকা জমা রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন!"

ঘোষাল মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "শুধু কাঁদ্‌লেই ত হয় না বাপু! এসব মবলগ্ টাকাকড়ির কাণ্ড যে! সাক্ষী নেই, হাতচিঠা নেই, তাহ'লে কি রকম হবে বল দেখি?"

বিধবা ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু, কান্নার ফল যে কি হইবে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। একাদশী এবার কথা কহিল; ঘোষালের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আমার মনে হচ্চে, যেন পাঁচশ' টাকা কে জমা রেখে আর নেয় নি। তুমি একবার পুরোনো খাতাগুলো খুঁজে দেখ দিকি, কিছু লেখা-টেখা আছে না কি?"

ঘোষাল ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "কে এত বেলায় ভূতের ব্যাগার খাট্‌তে যাবে বাবু? সাক্ষী নেই, রসিদ পত্তর নেই—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বারের অন্তরাল হইতে জবাব আসিল, "রসিদ-পত্তর নেই ব'লে কি ব্রাহ্মণের টাকাটা ডুবে যাবে না কি? পুরানো খাতা দেখুন—আপনি না পারেন আমাকে দিন, দেখে দিচ্চি।"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দ্বারের প্রতি চোখ তুলিল ; কিন্তু, যে হুকুম দিল, তাহাকে দেখা গেল না।

ঘোষাল নরম হইয়া কহিল, "কত বছর হয়ে গেল মা ! এতদিনের খাতা খুঁজে বার করা ত সোজা নয়। খাতাপত্তরের আণ্ডিল ! তা জমা থাকে, পাওয়া যাবে বৈ কি !" বিধবাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "তুমি বাছা কেঁদো না,—হক্কের টাকা হয় ত, পাবে বৈ কি। আচ্ছা, কা'ল একবার আমার বাড়ী যেয়ো ; সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রে খাতা দেখে বার কোরে দেব ! আজ এত বেলায় ত আর হবে না !"

বিধবা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, বাবা, কাল সকালেই আপনার ওখানে যাবো।"

"যেয়ো" বলিয়া ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া সম্মুখের খোলা খাতা সেদিনের মত বন্ধ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ছলে বিধবাকে বাড়ীতে আহ্বান করার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্তরাল হইতে গৌরী কহিল, "আট বছর আগের—তাহলে ১৩০১ সালের খাতাটা একবার খুলে দেখুন ত, টাকা জমা আছে কি না ?"

ঘোষাল কহিলেন, "এত তাড়াতাড়ি কিসের মা !"

গৌরী কহিল, "আমাকে দিন, আমি দেখে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের মেয়ে দু'কোশ হেঁটে এসেছেন—দু'কোশ এই রৌদ্রে হেঁটে যাবেন, আবার কাল আপনার কাছে আসবেন ;—এত হাঙ্গামায় কাজ কি ঘোষাল-কাকা ?"

একাদশী কহিল, "সত্যিই ত ঘোষাল-মশাই ; ব্রাহ্মণের মেয়েকে মিছামিছি হাঁটানো কি ভালো ? বাপ্‌রে ! দাও, দাও, চট্‌পট্ দেখে দাও।"

ক্রুদ্ধ ঘোষাল তখন রুষ্টকণ্ঠে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘর হইতে ১৩০১ সালের খাতা বাহির করিয়া আনিলেন। মিনিট-দশেক পাতা উল্টাইয়া

হঠাৎ ভয়ানক খুসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ! আমার গৌরী-মায়ের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি। ঠিক এক সালের খাতাতেই জমা পাওয়া গেল! এই যে রামলোচন চাটুয্যের জমা পাঁচশ'—"

একাদশী কহিল, "দাও চট্‌পট্ সুদটা ক'ষে দাও, ঘোষাল-মশাই!"

ঘোষাল বিস্মিত হইয়া কহিল, "আবার সুদ?"

একাদশী কহিল, "বেশ, দিতে হবে না! টাকাটা এতদিন খেটেচে ত, বোসে ত থাকেনি। আট বছরের সুদ—এই ক'মাস সুদ বাদ পড়্‌বে।"

তখন সুদে আসলে প্রায় সাড়ে সাতশ' টাকা হইল। একাদশী ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "দিদি, টাকাটা তবে সিন্দুক থেকে বা'র কোরে আন্। হাঁ বাছা, সব টাকাটাই এক সঙ্গে নিয়ে যাবে ত?"

বিধবার অন্তরের কথা অন্তর্যামী শুনিলেন; চোখ মুছিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "না বাবা, অত টাকায় আমার কাজ নেই; আমাকে পঞ্চাশটি টাকা এখন শুধু দাও।"

"তাই নিয়ে যাও মা। ঘোষাল-মশাই, খাতাটা একবার দাও, সই-কোরে দিই; আর বাকি টাকার তুমি একটা চিঠি ক'রে দাও।"

ঘোষাল কহিল, "আমিই সই কোরে দিচ্চি। তুমি আবার—"

একাদশী কহিল, "না না, আমাকেই দাও না ঠাকুর, নিজের চোখে দেখে দিই।" বলিয়া খাতা লইয়া অর্দ্ধ-মিনিট চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল, "ঘোষাল-মশাই, এই যে একযোড়া আসল মুক্তো ব্রাহ্মণের নামে জমা রয়েচে। আমি জানি কি না—ঠাকুর-মশাই আমাদের সব সময়ে চোখে দেখ্‌তে পায় না," বলিয়া একাদশী দরজার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। এতগুলি লোকের সুমুখে মনিবের এই ব্যঙ্গোক্তিতে ঘোষালের মুখ কালি হইয়া গেল।

সে দিনের সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে, অপূর্ব্ব সঙ্গীদের লইয়া যখন উত্তপ্ত পথের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার মনের মধ্যে একটা

বিপ্লব চলিতেছিল। ঘোষাল সঙ্গে ছিল; সে সবিনয় আহ্বান করিয়া কহিল, "আসুন, গরীবের ঘরে অন্ততঃ একটু গুড় দিয়েও জল খেয়ে যেতে হবে।"

অপূর্ব্ব কোন কথা না কহিয়া নীরবে অনুসরণ করিল। ঘোষালের গা জ্বলিয়া যাইতেছিল; সে একাদশীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "দেখ্‌লেন, ছোটলোক ব্যাটার আস্পর্দ্ধা! আপনাদের মত ব্রাহ্মণ-সন্তানের পায়ের ধুলো প'ড়েচে, হারামজাদার চোদ্দ-পুরুষের ভাগ্যি; ব্যাটা পিশেচ কি না পাঁচগণ্ডা পয়সা দিয়ে ভিখিরী বিদেয় কর্‌তে চায়।"

বিপিন কহিল, "দু'দিন সবুর করুন না; হারামজাদা মহাপাপীর ধোপা নাপ্‌তে বন্ধ ক'রে পাঁচগণ্ডা পয়সা দেওয়া বা'র ক'রে দিচ্চি। রাখালবাবু আমাদের কুটুম, সে মনে রাখ্‌বেন ঘোষাল-মশাই।"

ঘোষাল কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ। দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক না কোরে জলগ্রহণ করি নে, দু'টো মুক্তোর জন্যে কি রকম অপমানটা দুপুর-বেলায় আমাকে কর্‌লে, চোখে দেখ্‌লেন ত। ব্যাটার ভাল হবে? মনেও কোর্‌বেন না। সে বেটী—যারে ছুঁলে নাইতে হয়,—কি না বামুণের ছেলের তেষ্টায় জল নিয়ে আসে। টাকার গুমরটা কি রকম হ'য়েচে, একবার ভেবে দেখুন দেখি।"

অপূর্ব্ব এতক্ষণ একটা কথাতেও কথা যোগ করে নাই, সে হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, "অনাথ, আমি ফিরে চল্‌লুম ভাই—আমার ভারি তেষ্টা পেয়েচে!"

ঘোষাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "ফিরে কোথায় যাবেন? ঐ ত আমার বাড়ী দেখা যাচ্চে।"

অপূর্ব্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, "আপনি এদের নিয়ে যান,—আমি যাচ্চি ঐ একাদশীর বাড়ীতেই জল খেতে!"

একাদশীর বাড়ীতে জল খেতে! সকলেই চোখ কপালে তুলিয়া

দাঁড়াইয়া পড়িল। বিপিন তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল, “চল, চল,—দুপুর রোদ্দুরে রাস্তার মাঝখানে আর চঙ করতে হবে না। তুমি সেই পাত্রই বটে! তুমি খাবে একাদশীর বোনের ছোঁয়া জল!”

অপূর্ব্ব হাত টানিয়া লইয়া দৃঢ় স্বরে কহিল, “সত্যিই আমি তার দেওয়া সেই জলটুকু খাবার জন্যে ফিরে যাচ্ছি। তোমরা ঘোষাল-মশায়ের ওখান থেকে খেয়ে এসো—ঐ গাছতলায় আমি অপেক্ষা কোরে থাকব।”

তাহার শান্ত স্থির কণ্ঠস্বরে হতবুদ্ধি হইয়া ঘোষাল কহিল, “এর প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়, তা জানেন?”

অনাথ কহিল, “ক্ষেপে গেলে না কি?”

অপূর্ব্ব কহিল, “তা জানি নে। কিন্তু, প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয় ত সে তখন ধীরে-সুস্থে ভাবা যাবে। কিন্তু এখন ত পার্‌লাম না”—বলিয়া সে এই খর-রৌদ্রের মধ্যে দ্রুতপদে একাদশীর বাড়ীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

গ্রন্থকার প্রণীত পুস্তকাবলী

১। বিরাজ-বৌ (ত্রয়োদশ সংস্করণ) ... ১৸০
ঐ হিন্দি সংস্করণ (প্রথম সংস্করণ) ... ১।০
২। বিন্দুর-ছেলে (ত্রয়োদশ সংস্করণ) ... ২৲
৩। বড়দিদি (একাদশ সংস্করণ) ... ১৲
৪। পণ্ডিত মশাই (চতুর্থ সংস্করণ) ... ১।০
৫। অরক্ষণীয়া (নবম সংস্করণ) ... ॥০
৬। বৈকুণ্ঠের উইল (চতুর্থ সংস্করণ) ... ১৲
৭। মেজদিদি (ষষ্ঠ সংস্করণ) ... ১।০
৮। চন্দ্রনাথ (ত্রয়োদশ সংস্করণ) ... ॥০
৯। পরিণীতা (উনবিংশ সংস্করণ) ... ১৲
১০। দেবদাস (চতুর্থ সংস্করণ) ... ১॥০
১১। শ্রীকান্ত—১ম পর্ব্ব (পঞ্চম সংস্করণ) ... ১॥০
১২। শ্রীকান্ত—২য় পর্ব্ব (চতুর্থ সংস্করণ) ... ১॥০
১৩। শ্রীকান্ত—৩য় পর্ব্ব (চতুর্থ সংস্করণ) ... ১॥০
১৪। কাশীনাথ (তৃতীয় সংস্করণ) ... ১॥০
১৫। নিষ্কৃতি (পঞ্চম সংস্করণ) ... ॥০
১৬। চরিত্রহীন (চতুর্থ সংস্করণ) ... ৩॥০
১৭। স্বামী (ত্রয়োদশ সংস্করণ) ... ১৲
১৮। দত্তা (পঞ্চম সংস্করণ) ... ... ২॥০
১৯। ছবি (চতুর্থ সংস্করণ) ... ... ॥০
২০। গৃহদাহ (প্রথম সংস্করণ) ... ৪৲
২১। পল্লী-সমাজ (একাদশ সংস্করণ) ... ॥০
২২। বামুনের মেয়ে (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ১৲
২৩। দেনা-পাওনা (তৃতীয় সংস্করণ) ... ২॥০
২৪। নব-বিধান (তৃতীয় সংস্করণ) ... ১॥০
২৫। হরিলক্ষ্মী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ১৲
২৬। ষোড়শী [নাটক] (চতুর্থ সংস্করণ) ... ১৲
২৭। রমা [নাটক] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ১৲
২৮। শেষ-প্রশ্ন (প্রথম সংস্করণ) ... ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা